ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৫ সংখ্যা ।। ২৮ ভাদ্র, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

কোনও দলই সঙ্ঘের কাছে শত্রু নয় ঃ ভাগবত

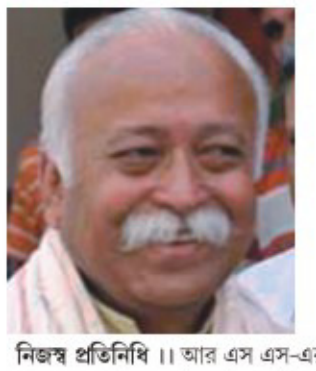

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আর এস এস-এর নতুন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত আরও একবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, বিজেপি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রাজনৈতিক শাখা নয়। এমনকী কোনও রাজনৈতিক দলই সঙ্ঘের কাছে শত্রু

(এরপর ৪ পাতায়)

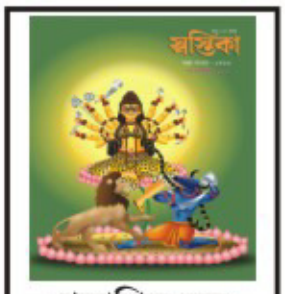

প্রকাশিত হল

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে
ঢাকায় দুর্গাপুজো বয়কট

গূঢ়পুরুষ ।। ঢাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ঘরবাড়ি জবর দখল, মন্দির ভাঙা, হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানিসহ জোর করে শাদি করা ইত্যাদি ঘটনায় ক্ষুব্ধ ও আতঙ্কিত হিন্দুরা এবার ঢাকার তাঁতি বাজার, লক্ষ্মী বাজার, শাঁখারি বাজার ও রায়ের বাজারে বারোয়ারি দুর্গাপুজো বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জানা গেছে যে এবার রমজান, ইদ ও পুজোর সময়ে পাড়ায় হিন্দুরা হামলার আশঙ্কা করছেন। তাই দুর্গাপুজো বন্ধ করে হিন্দুদের উপর চলা লাগাতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানাতে চান।

গত আগস্ট মাসে হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুঠের একাধিক ঘটনা ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় ঘটেছে। তার কয়েকটি উল্লেখ করছি। ঢাকার সূত্রাপুরে ঋষিকেশ দাস লেনে বাস করেন নিতাই দাসের পরিবার। তাঁর ঘরবাড়ি ও বসত জমির উপর নজর পড়ে স্থানীয় জমি মাফিয়া আলমগীরের। নিতাইবাবু তাঁর পূর্ব-পুরুষের ভিটা আলমগীরকে ছেড়ে দিতে রাজি না হওয়ায় ২৫ আগস্ট গভীর রাতে সশস্ত্র মাফিয়া বাহিনী হানা দিয়ে তাঁর পরিবারের ৯ জনকে অপহরণ করে। শর্ত দেওয়া হয় ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলে তবেই অপহৃতদের মুক্তি দেওয়া হবে। সেই রাতে গুন্ডা বাহিনীর বোমাবাজি এবং নিতাইবাবুর পরিবারের আর্ত চিৎকার সত্ত্বেও তাঁর মুসলিম প্রতিবেশীরা কেউই বাধা দিতে এগোয়নি। পরের দিন সূত্রাপুর থানায় ১৬ জন অপহরণকারীর নাম ধাম দিয়ে নিতাইবাবু এফ আই আর দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ অপহৃতদের উদ্ধারের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কারণ, জমি মাফিয়া আলমগীর ক্ষমতাসীন দল আওয়ামি লিগের আশ্রয়পুষ্ট।

ঢাকায় গত তিন মাসে মোট ৬৮টি হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

ঢাকায় দুর্গাপুজো (ফাইলচিত্র)।

স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুরা আতঙ্কিত। উচ্ছেদের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে ৩০ মার্চ। সেদিন ঢাকার আর এস দাস রোডে ১০টি হিন্দু পরিবারকে দুষ্কৃতীরা উচ্ছেদ করেছিল। তারপর একাধিক ঘটনায় শেখ হাসিনার প্রশাসনের চোখের সামনে মোট ৬৮টি হিন্দু পরিবারকে ভিটেমাটি ছাড়া করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। থানা থেকে পরামর্শ দেওয়া হয় আদালতে মামলা করতে। কারণ, জমি বিরোধ আদালতের নির্দেশ ছাড়া পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ ও প্রশাসনের যোগসাজসে জমি মাফিয়ারা দলিল জালিয়াতি করে হিন্দুদের ঘরবাড়ি জমি জবর দখল করছে। যেমন, গত আগস্টে বাংলাদেশের প্রয়াত কম্যুনিস্ট নেতা মণিকৃষ্ণ সেনের রঙপুর শহরের মৌলাটোলা এলাকায় পিতৃ-পুরুষের ভিটেমাটি জমি মাফিয়ারা দখল করে জাল দলিল আদালতে পেশ করে। প্রয়াত সেনের ভিটেয় চারটি হিন্দু পরিবার বাস করতেন। উচ্ছেদ হওয়ার পর তাঁরা এখন পথের ভিখারি।

এই ঘটনাটির উল্লেখ বিশেষভাবে করলাম এই কারণে যে এখানে হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কিছুটা প্রতিরোধ করেন। সেনবাড়ির ভিটেয় দুর্গা মন্দিরে মাফিয়া

(এরপর ৪ পাতায়)

বাজার আগুন মজুতদারীতে মদত দিচ্ছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আলুর দাম বর্তমানে কেজি প্রতি ২০ থেকে ২২ টাকা। পুজোর সময় তা বেড়ে গিয়ে ২৫-৩০ এ ঠেকবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। চিনির দাম বর্তমানে কেজি প্রতি ৩৪ টাকা। পুজোর সময় এটাই বেড়ে গিয়ে হতে পারে

৪০-৫০ টাকার মতো। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে প্রথমে খরার একটা অজুহাত দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তও মেনে নিয়েছেন রাজ্যের হিমঘরগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্টই বেশি আলু সঞ্চিত রয়েছে। সরকারের এনফোর্সমেন্ট বিভাগও এক প্রকার স্বীকার করেই নিয়েছে রাজ্যে যথেষ্ট বে-আইনী মজুতদারী রয়েছে। তবুও রাজ্যের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ এখনও পর্যন্ত কেন সেই হিমঘর মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না তা যথেষ্ট ধোঁয়াশা-র মধ্যে রয়েছে। সরকারের ভেতরেই একটা পক্ষ বলছে, ভোটের আগে সরকারি পার্টি হিমঘর মালিকদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করেছে। সেই টাকাই সুদসহ এখন হিমঘর মালিকদের কাছে ফেরতের ব্যবস্থা করতে সরকার প্রচ্ছন্নভাবে বে-আইনী মজুতদারীতে মদত যোগাচ্ছে।

এট ঠিক, খরার কারণে এবার আলু এবং খরিফ শস্য হিসেবে আখের উৎপাদন যথেষ্ট কম হয়েছে। কিন্তু ৬ টাকার আলু ২৫ টাকায় এবং ১৮ টাকা কেজির চিনি ৫০ টাকায় পৌঁছ যাবার কোনও যুক্তিই নেই। বিশেষ করে অবাধ বাণিজ্যের কারণে যখন আমদানী করার প্রভূত সুযোগ রয়েই গেছে সরকারের সামনে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়। কিন্তু বাস্তব হিসেবটা একটু অন্যরকম। গত বছর প্রায় ৬০-৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন কৃষি-বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের ধারণা এবারে অন্তত ৫০-৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। তাতে গত বছর যেখানে আলুর কেজি ছিল ৭-৮ টাকা, এবার সেখানে তা ২২-২৫ টাকা হয় কি করে? হিমঘরের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই এর উত্তর মিলতে পারে। রাজ্যে এখন হিমঘরের সংখ্যা প্রায় আড়াইশ-র কাছাকাছি। এর কোনওটার ক্যাপাসিটি ৫০ হাজার টন আলু, আবার কোনওটাতে আলু ধরতে পারে প্রায় দু'লক্ষ টনের কাছাকাছি। সব মিলিয়ে ৪৮-৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন কাঁচা আলু ধরতে পারে হিমঘরে। পরে হিমঘর থেকে বেরোনর সময় এই আলুগুলোর ওজনই ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন মতো হয়ে যাবে।

এখনও পর্যন্ত আলুর আকাল এমনটা কিন্তু কোনও বাজারে দেখা যাচ্ছে না। পয়সা ফেললেই যথেচ্ছ পরিমাণ আলু মিলবে। হিমঘর মালিকদের একাংশের দুর্নীতির কথা একটা ছোট শিশুও জানে। কিন্তু মানিব্যাঙ্কের স্বার্থে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই হিমঘরে অনুসন্ধানের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশই দেয়নি।

এর পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে আরও একটা কারণে। সেটা হল রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার অভাব। মোটামুটিভাবে আলুর ফলন বেশি হয়ে গেলে তা যখন হিমঘরে ঢোকাতে পারা যায় না তখন তা উত্তরপ্রদেশে

(এরপর ৪ পাতায়)

সেনার হাতে সেকেলে গ্রেনেড
প্রতি তিনটির একটা অকেজো

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সামরিক অস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশারদদের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এক শিহরণ জাগানো খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, আমাদের দেশের সীমান্তরক্ষীরা যে সকল হ্যান্ড-গ্রেনেড ব্যবহার করেন তার ৩০ শতাংশই কার্যক্ষেত্রে অকেজো। সংকট সময়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেনারা যখন গ্রেনেড চার্জ করেন তার প্রতি তিনটির মধ্যে একটিতে কোনও কাজ হয় না। এ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

ভাবলে গা শিউরে উঠবে একজন যোদ্ধা তার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সীমান্তে দেশরক্ষার্থে পিনটা খুলে গ্রেনেডেটা আওয়ান শত্রুর দিকে ছুঁড়ল আর তা বার্স্ট করল না। আর উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। অথচ জওয়ানদের কাছে স্থলযুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে গ্রেনেডই প্রধান ভরসা। পরমুহূর্তের অবস্থাটা কল্পনা করুন। সীমান্তরক্ষী জওয়ানদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই সমরাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা এই সমীক্ষা করেছেন। তবে সমীক্ষার ঠিক ঠিক সংখ্যাটা প্রতিরক্ষার গোপনীয়তার স্বার্থেই প্রকাশ করা হয়নি। এর সঙ্গে প্রতিরক্ষা প্রকল্পের গুণমান ও মর্যাদাও জড়িয়ে আছে। জওয়ানরা চিরাচরিত হ্যান্ড-গ্রেনেড হাতে জীবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বিপজ্জনক এলাকায় লড়াই করেন।

মুখোমুখি লড়াইয়ে গ্রেনেড একজন সৈনিকের তূণে সর্বশেষ কার্যকরী অস্ত্র বলেই বিবেচিত। এই গ্রেনেড দেশের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়ে সেনাদের কাছে আসে। সেনাদের কথায়, অনেক সময়ই টেকনিক্যাল কারণে গ্রেনেডগুলো ফাটে না, তখন তাঁদের ভগবান ভরসা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। একটি সূত্রে এই কথা জানা গেছে।

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

ডব্লিউ টি ও-র বিরুদ্ধে বি এম এসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। WTO-তে ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার দাবী জানাল ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ । এই দাবীর সমর্থনে গত ২ সেপ্টেম্বর দিল্লীর পার্লামেন্ট স্ট্রীটে দুটি সংগঠনের কার্যকর্তা ও সমর্থকরা ভারত সরকার এবং ডব্লিউ টি ও'-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের স্লোগান ছিল — ডব্লিউ টি ও, ভারত ছাড়ো;ভারত সরকার ডব্লিউ টি ও ছাড়ো। কৃষকের স্বার্থ রক্ষা কর। পরে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করেন।

বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সরোজ মিত্র, মুরলীধর রাও, অরুণ ওঝা, কে লক্ষ্মা রেড্ডি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সারা দেশ থেকে হাজার হাজার কৃষক এই বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন। প্রসঙ্গত, পরের দিন থেকেই দিল্লীতে ডব্লিউ টি ও-র বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সম্মেলন উপলক্ষে সেইসব প্রতিনিধিরা দিল্লীতে আসতে শুরু করেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে — ভারত সরকার ডব্লিউ টি ও বা বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন তার ফলে ভারতীয় কৃষকদের দুরবস্থার একশেষ হবেই। অকৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মীরা বিপদে পড়বেনই। ইউ পি এ সরকারকে সাধারণ মানুষ ক্ষমতায় বসিয়েছে, সেজন্য তারা অবশ্যই আশা করেন যে, বর্তমান সরকার তাদের স্বার্থ রক্ষা করবেন। অন্যথা তাদের প্রতি বেইমানি করা হবে। ডব্লিউ টি ও-র সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় একথা মনে রাখতে হবে।"

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে — যে চুক্তি ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থ বিঘ্নিত করবে তেমন কোনও চুক্তি যেন পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে না করা হয়। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে, WTO-ভুক্ত ৩৫টি দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীদের দু'দিনের বৈঠকের (৩, ৪, সেপ্টেম্বর, ০৯) ব্যবস্থা করেছে ভারত সরকার। সেক্ষেত্রে ভারত অতিথেয়তার ঠেলায় স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার কথা যেন বিস্মৃত না হয়।

এদিকে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সরকার শীঘ্রই দোহা রাউণ্ডের বাকী আলোচনা শেষ করতে চায়। সেক্ষেত্রে পশ্চিমী দুনিয়ার কর্পোরেট সেক্টর-ই এবং বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোই লাভবান হবে মাত্র। এদেশের কৃষি ও কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ডব্লিউ টি ও বিদেশী জীবনদায়ী ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোর লভ্যাংশে আদৌ হস্তক্ষেপ করতে চায় না। উন্নতিশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো কখনই ওই জীবনদায়ী ওষুধ স্বদেশে তৈরি করতে পারবে না। তাদেরকে চিরকাল বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীর উপরই নির্ভরশীল থাকতে হবে বলে বি এম এস ও স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছে। প্রসঙ্গত, ওইদিন (২ সেপ্টেম্বর) কলকাতায় ধর্মতলায় একই উদ্দেশ্যে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সভায় বক্তব্য রাখেন বি এম এস-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক বৈজনাথ রায় এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রদেশ আহ্বায়ক সুব্রত মন্ডল প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নমাজের জায়গা চান হিন্দুতীর্থ হরিদ্বারে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সারা পৃথিবীর হিন্দুদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র হল হরিদ্বার। সেই হরিদ্বারে রমজান মাসে ইফতার এবং নমাজ পাড়ার জন্য স্থায়ী জায়গা দিতে মাঠে নেমেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হরিশ রাওয়াত। হরিদ্বারের মঠ-মন্দির, আখড়া-আশ্রমের সাধু-সন্তরা এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শ্রম-রোজগার মন্ত্রী হরিশ রাওয়াতকে সমবেতভাবে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য, এভাবে মুসলিম তোষণের মাধ্যমে ভোট-ব্যাঙ্ক স্ফীত করার চেষ্টা দেড় বছর আগেই করেছিল মুসলমানদের মসীহা তথা সমাজবাদী পার্টির নেতা মুলায়ম সিং যাদব। সমাজবাদী পার্টির উদ্যোগে তখন হরিদ্বারের সর্বাধিক শ্রদ্ধার কেন্দ্রস্থল — গঙ্গার ঘাট হর কি পৌড়িতে নমাজ পাঠ ও ইফতারের খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। তখনই হরিদ্বারের সন্ত সমাজ এই ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। গত এক সপ্তাহ ধরে কুম্ভনগরী হরিদ্বারে কংগ্রেসী মন্ত্রীর মুসলিম তুষ্টীকরণের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন সাধু-সন্ত ও হরিদ্বারবাসীরা। তাঁরা নমাজের জন্য জায়গা দিতে রাজী নন।

হরিদ্বারের সন্তদের শক্তিশালী সংগঠন আখাড়া পরিষদ, গঙ্গা মহাসভা প্রভৃতি সংগঠন আন্দোলনে নামবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খবর জানিয়েছে অখিল ভারতীয় আখাড়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হরিগিরি মহারাজ। হরিগিরি মহারাজ বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র হরিদ্বারের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করতে চলেছেন। জয়রাম আশ্রমের প্রধান ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহারাজ ওই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নমাজের জন্য জায়গা দেওয়ার কথা না ভেবে বরং হরিদ্বারবাসীর অসুবিধা দূর করার দিকেই মনযোগ দিতে বলেছেন। গঙ্গাসভার সভাপতি পণ্ডিত রামকুমার মিশ্রর কথা হল — হরিশজী কীরকমভাবে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য নষ্ট করার কাজ করছেন তা তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের কাছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার দাবী জানিয়েছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি বীরেন্দ্র কীর্তি পাল বলেছেন, হরিশ রাওয়াত অসামাজিক ব্যক্তিদেরকে গন্ডগোল বাধাতে সাহায্য করছেন। হরিদ্বারের হিন্দু সমাজ এটা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হরিশ রাওয়াতের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালাবে। ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে হরিশের কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। যুবমোর্চা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সত্বর জনগণের কাছে ক্ষমতা চাওয়ারও দাবী জানিয়েছে।

এই সময়

ইউ জি সি-র নয়া বিধি

এখন থেকে আর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ওপেন ইউনিভার্সিটি)-এর অধীন গবেষণাকে সরকারি কোনও স্বীকৃতি দেবে না বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ জি সি)। ইউ জি সি-র বক্তব্য, পি এইচ ডি এবং এম ফিল প্রত্যেকটিই গবেষণামূলক ডিগ্রী যা অত্যন্ত মনযোগের সঙ্গে করা দরকার। কিন্তু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকার দরুণ এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত বা গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীরাও আংশিক সময় গবেষণায় রত থাকেন বলে তাদের পক্ষে শিক্ষার বিষয়গুলোতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। তাই এহেন সিদ্ধান্ত ইউ জি-সি-র। তাদের এই সিদ্ধান্তে ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও ১৩টি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি এবং এম ফিল করা অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীরা যে বিপাকে পড়বেন তা বলাই বাহুল্য।

পাক বিপদ-সঙ্কেত

সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের একটি গোপন প্রতিবেদনে ভারতের সুরক্ষা প্রশ্নে অশনি সংকেত হিসেবে পুনরায় উঠে এসেছে পাকিস্তানের নাম। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুণগত এবং সংখ্যাগত মানে ক্রমশই উন্নত হয়ে উঠছে। ওই প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের এখন প্রাথমিক টার্গেট হলো ভারত। এবং আগামী দিনে তারা ভারতের সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে এমন কিছু কান্ড বাধাবে যাতে এদেশের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের একটা জুৎসই অজুহাত পাওয়া যায়।

রেলের পরীক্ষা ঊর্দুতে

যাই বলুন না কেন মশাই, রেলে মাদ্রাসা ছাত্রদের ঢোকানো চাই-ই। কি বললেন, তারা ইংরেজি জানে না? তাতে কি? স্বয়ং রেলমন্ত্রী গত ৬ সেপ্টেম্বর এক ইফতার পার্টিতে ঘোষণা করেন এবার থেকে রেলের পরীক্ষা ঊর্দুতেও দেওয়া যাবে। ঈদের আগে সংখ্যালঘুদের মোক্ষম উপহার মমতার। এই শুনে এক দুর্মুখের রসিকতা "দিদি যা শুরু করেছেন! রেল বাজেটের গোটাটাই না সংখ্যালঘু উন্নয়ণ খাতে চলে যায়।"

কোণঠাসা বুদ্ধ

বারবার তিনবার। নানান অজুহাতে পরপর দু'বার পলিটব্যুরো ও একবার কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গেলেন না মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এই নিয়ে বুদ্ধর ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত। পার্টিতে বুদ্ধ পন্থীরা বলছেন, ভোটে পরাজয়ের সব দায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ায় বেজায় মনোকষ্টে রয়েছেন তিনি। কিন্তু বেজায় চটে রয়েছেন দলের কারাতপন্থীরা। মুখে না বললেও হাবে-ভাবে তাঁরা বোঝাচ্ছেন, বুদ্ধর ডেটলাইন সামনের পলিটব্যুরো মিটিং। না এলেই মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে ঘাড় ধাক্কা।

পৌষমাস ও সর্বনাশ

একেই বলে — কারুর পৌষমাস আর কারুর সর্বনাশ। বিদায় বেলায় অকস্মাৎ আগত বর্ষা কিছুটা হলেও পুজোর মুখে হাসি ফুটিয়েছে চাষীদের মুখে। কিন্তু মাথায় হাত পড়েছে প্রতিমা শিল্পী ও পুজো উদ্যোক্তাদের। শেষবেলায় বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে প্রতিমার রং তো শুকোচ্ছেই না, উপরন্তু রাস্তায় জল জমে আর খড়ের চাল চুঁইয়ে জল পড়ে জীবন দুর্বিসহ করে দিয়েছে কুমোরটুলির প্রতিমাশিল্পীদের। এদিকে প্যান্ডেলে বাঁশ ফেলার কাজ শেষ। ত্রিপল ঢাকতে যেতেই ঝমঝমিয়ে এল বৃষ্টি। চারিদিকে কাদায় ফুরফুরে মেজাজটা বেশ খিঁচড়েই গেছে পুজো-উদ্যোক্তাদের ।

পাল্টা জবাব

কিছুদিন আগে লোকসভার প্রাক্তন স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি সংবাদপত্রকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তাঁর ধারণা সিপিএমের কতিপয় সাংসদ নাকি জানতেন বিজেপি ঘুষ-কান্ডের নাটক করবে। সোমনাথ এটাই বলতে চাইছিলেন, আস্থা ভোটের সময় কংগ্রেসী সাংসদদের ঘুষ নেবার যে অভিযোগ বিজেপি করেছিল তা নাকি ছিল সাজানো, নাটক। আর এসব নাকি জানতেন কতিপয় সিপিএম সাংসদ। এর পাল্টা হিসেবে সিপিএম তাদের মুখপত্র পিপুল'স ডেমোক্রেসিতে লিখেছে, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় যখন সবজান্তা, তখন ১৯ জন এমপিকে কংগ্রেস যে ভোটের ঘোড়া কেনাবেচায় কিনে নিয়েছিল তা কি তিনি জানতেন না, নাকি না জানার ভান করে ছিলেন?

দশে পাঁচ

এদেশের লোক না খেয়ে থাকতেই পারেন। তবে এটা মানতেই হবে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেটীয় সংস্থাটি হলো ভারতেরই বি সি সি আই। যার নতুন করে প্রমাণ রাখলেন পাঁচ ভারতীয় ক্রিকেটার। সম্প্রতি ফোর্বস বিশ্বের ধনী ক্রিকেটারদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তার প্রথম দশজনের মধ্যে পাঁচজনই হলেন এদেশের ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেটারদের এই 'মহেন্দ্রক্ষণে' সর্বাগ্রে রয়েছেন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনী। বাকিরা হলেন শচীন তেন্ডুলকার, যুবরাজ সিং, রাহুল দ্রাবিড় ও সৌরভ গাঙ্গুলি।

স্বপ্ন সফল

স্বপ্ন সফল হতে চলেছে এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে মেরি ইম্মাকুলেট স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সায়ন্তন ভট্টাচার্যের। ছেলেবেলা থেকেই তার স্বপ্ন মহাকাশচারী হয়ে মহাকাশে ভ্রমণ করবে। কাজ করবে নাসায় (ন্যাশানাল অ্যারোনটিক্স স্পেস অ্যাসোসিয়েশন)। অবশেষে ডাক এসেছে নাসা থেকে। ভারতের একমাত্র ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সে কিছুদিনের মধ্যেই উড়ে যাবে ফ্লোরিডায়। সেখানে অরল্যান্ডো বলে একটা জায়গায় নাসার অনুষ্ঠানে তার তৈরী 'স্পেস সিটি' মডেল নিয়ে বলবে পনেরো বছরের খুদে সায়ন্তন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চীনের অনধিকার প্রবেশ

চীন আবার ভারত আক্রমণের ছক কষিতেছে। ইদানীং পরপর কয়েকটি ঘটনা হইতে সেই রকমই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি এক প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে গত ৩১ জুলাই লাদাখের আন্তর্জাতিক সীমানা লঙঘন করিয়া চীনা সেনাবাহিনী ভারতে ঢুকিয়া পড়ে স্থানটি লে-র পূর্ব দিকে — লাদাখ, হিমাচল প্রদেশের স্ফিতি এবং তিববতের সংযোগ স্থলে এখানে বৃটিশ আমল হইতে ২২ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতার মাউন্ট গিয়া পর্বত ভারত ও চীনের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা হিসাবে চিহ্নিত। চীনা সেনাবাহিনী সেই চিহ্নিত সীমারেখা লঙঘন করিয়া প্রায় দেড় কিলোমিটার ভিতরে ঢুকিয়া পাহাড়ের গায়ে স্প্রে পেন্ট দিয়া লাল রঙে ক্যান্টনিজ ভাষায় 'চায়না' শব্দটি লিখিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশের পাশাপাশি এইবার জম্মু-কাশ্মীরের লাদাখ ডিভিশনও নিজেদের বলিয়া চীন দাবী করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ভারতেরই জম্মু-কাশ্মীরের আকসাই চীন এলাকা পাকিস্তান দখল করিয়া ৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে চীনকে উপঢৌকন দিয়াছিল। এরপর চীন অরুণাচল প্রদেশকে যেমন ভারতের অংশ বলিয়া স্বীকার করে না, তেমনই মাঝেমধ্যেই সিকিমকেও তারা ভারতের অংশ বলিয়া মানিতে চায় নাই। এখন দেখা যাইতেছে, চীন লাদাখ এলাকার দিকেও চোখ দিয়াছে। সেনাবাহিনীর হিসাব অনুযায়ী জুন মাসে ২১ বার, জুলাই মাসে ২০ বার এবং আগস্ট মাসে ২৪ বার অর্থাৎ গত তিন মাসে কমপক্ষে ৬৫ বার ভারতের সীমান্ত লঙঘন করিয়াছে।

কয়েক মাস আগে চায়না ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (সি আই আই এস এস) নামে চীনের একটি প্রভাবশালী গবেষণা সংস্থা তাহাদের ওয়েবসাইটে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছে। ওই প্রবন্ধ হইতে জানা গিয়াছে, চীন ভারতকে কুড়ি থেকে তিরিশটি স্বাধীন রাষ্ট্রে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কূট পরিকল্পনা করিতেছে। এবং এই কাজে চীনকে সাহায্য করিবে চীনের বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান ও নেপাল।

গত সপ্তাহে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিমান বাহিনীর একটি বিমান আবুধাবি হইতে চীনের জিয়া ইয়াং যাওয়ার পথে কলকাতা বিমান বন্দরে তেল ভরিতে অবতরণ করিয়াছিল বিমানটি অস্ত্রশস্ত্র বহন করিলেও সামরিক কোড ব্যবহার না করায় রহস্য ঘনীভূত হয় আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙঘনকে কেন্দ্র করিয়া চীনের সঙ্গে যখন ভারতের টানাপোড়েন চলিতেছে তখন তথ্য গোপন করিয়া বিমানটি চীনে যাচ্ছিল কেন — এই প্রশ্ন সঙ্গত কারণে উঠিয়াছে এই প্রসঙ্গে পুরুলিয়ায় অস্ত্রবর্ষণের ঘটনাটি স্মরণ করা যাইতে পারে।

চীনের এই ক্রমবর্ধমান ভারত-বিরোধী আগ্রাসী মনোভাব বাড়িতে থাকিলেও মনমোহন সিং সরকার অত্যন্ত নরম মনোভাব লইয়া চলিতেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ সাংবাদিকদের বলিয়াছেন, চীনের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত লইয়া কোনও সমস্যা নাই। চীনা সেনাদের সীমান্ত লঙঘন করিয়া ভারতে ঢুকিয়া পড়িবার যেসব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা দুই দেশের আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিয়া লওয়া যাইবে।

বিদেশমন্ত্রীর এই বক্তব্যে সামরিক ও কূটনৈতিক মহল বিস্মিত। কেন্দ্রের এই মনোভাবে দেশের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও ক্ষুব্ধ। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি যেভাবে বার বার সীমানা লঙঘন করিতেছে, তাহা উদ্বেগের। অথচ বিদেশমন্ত্রী বলিতেছেন, এমনটা ঘটিতেই পারে। কেননা ভারত যাহাকে নিয়ন্ত্রণ রেখা বলিয়া স্বীকার করে, চীন তাহা মানে না।

চীনের এই অনধিকার প্রবেশের প্রতি বিদেশমন্ত্রী তথা কেন্দ্রের মনমোহন সরকারের দুর্বলতা ভারতকে শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে। ১৯৬২-র পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ভারত পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে '৬২-র পুনরাবৃত্তি আর কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। চীন যদি শুধু 'ল্যাঙ্গুয়েজ অফ স্ট্রেন্থ' অর্থাৎ শক্তির ভাষাই বুঝে, তবে ভারতকেও সেই ভাষাতেই প্রত্যুত্তর দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

কোনও সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জানিতে হইলে তাহাকে পৃথক করিয়া লইয়া এবং কেবল তাহাতেই তাহার ভালোমন্দ, যুক্তিপূর্ণ এবং অযৌক্তিক, ন্যায্য এবং অন্যায্য সমস্ত কিছু লইয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে সেই সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট দৃষ্টি বা জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। কতকগুলি অত্যন্ত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলে আমাদের দর্শনশক্তি সরলভাবে কার্য করে না। প্রত্যেক মানুষই নিজের মনকে সংস্কৃতিবান করিয়া তুলিতে চায়। সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ আমরা প্রথম বৈদিক সাহিত্যে, ঐজরয় আরণ্যকে পাই। ঐ গ্রন্থে বিশেষভাবে একথা বলা হইয়াছে যে শিল্প হইতেই আত্মার সংস্কৃতি করা — "এতৈর যজমান আত্মনাং সংস্কুরুতে"।

— বিশ্ব ও ভারত, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচনা।

বিদেশী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ভারত সরকার তাড়াহুড়ো করছে কেন?

এন সি দে

সম্প্রতি কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় ইউ পি এ জোট সরকার বিদেশী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে বড় তাড়াতাড়ি শুরু করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি দেশ দ্বারা গঠিত অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন্স্-এর রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে আগামী অক্টোবর '০৯-এ এক শীর্ষ বৈঠকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন বলে আগে ঠিক ছিল। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে গত ১৩ আগস্ট '০৯ আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী আনন্দ শর্মাকে ছুটতে হল থাইল্যান্ডে ''আশিয়ান'' ভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে বাণিজ্য চুক্তিতে সই করার জন্য। এই দশটি দেশ হল, ব্রুনেই-কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইনস্, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম।

কিন্তু কেন এই তড়িঘড়ি? রাষ্ট্রের স্বার্থে? দলের স্বার্থে? পুঁজিপতিদের স্বার্থে? না, ভারতীয় শিল্পের স্বার্থে? যে দলের প্রতিষ্ঠাতা একজন বিদেশী, অক্টোভিয়ান হিউম এবং যে দলের বর্তমান সভাপতি একজন বিদেশিনী সনিয়া, সে দলের কাছে রাষ্ট্রের স্বার্থে কোনও কাজ আশা করাই বৃথা। বিদেশী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে দলের জন্ম সে দলের কাছে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থ অকিঞ্চিৎকর। সাম্রাজ্যবাদী প্রভু ও তাদের দালাল পুঁজিপতিদের স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজই কংগ্রেস দল ও সরকারের চিরকালই প্রধান লক্ষ্য ও কাজ। এই বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেসের এই সরকারের স্বার্থ। সেটাই এবার দেখার।

এই বাণিজ্য চুক্তির নাম দেওয়া হয়েছে ''মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি'' (Free Trade Agreement সংক্ষেপে FTA)। উদ্দেশ্য, বিদেশের দেশগুলোকে এদেশে ব্যাপকহারে বাণিজ্য বা ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া। এদেশে তাদের পণ্য বিক্রয় করতে কোনও আমদানী শুল্ক দিতে হবে না বা নামমাত্র শুল্ক দিতে হবে। এই ধরনের বাণিজ্য চুক্তি কিছুদিন আগেই করা হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে। নাম দেওয়া হয়েছে Comprehensive Economic Partnership Agreement সংক্ষেপে ট্রড্রত্নট্ট। এই রকম চুক্তি আরো অনেক দেশের সঙ্গে শীঘ্রই হতে চলেছে। যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এমনকী চীনের সঙ্গেও, যে চীন ভারতকে খন্ড খন্ড করে ভোগ দখলের রাজনৈতিক কৌশল সব সময়েই করে চলেছে। বাংলাদেশ ও মায়ানমার সরকার দু'টির সাহায্য নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছে। মায়ানমারের মিলিটারী জুন্টা সরকারকে সমর্থন দিয়ে বিনিময়ে তাদের দেশের কোকো দ্বীপে চীন একটি মিলিটারি বেস তৈরি করেছে। এই কোকো দ্বীপ ভারতের একেবারে দোরগোড়ায় আন্দামানের সন্নিকটে। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও শোনা যাচ্ছে এই CEPA নিয়ে আলোচনা চলছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হচ্ছে ভারত আমেরিকার সঙ্গে পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা চালু করেছে। সম্প্রতি মার্কিন ডেপুটি বাণিজ্য প্রতিনিধি ডিমিট্রিওস মারনাটিস-এর সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সচিব রাহুল খুল্লার আলোচনায় বসেছিলেন। সেই আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক Trade Policy Forum (TPF) পুনরায় গঠন করার পরিকল্পনা নিয়ে কথা হয়েছে।

এইসব দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলির সারবত্তা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। আমাদের দেশের সরকারগুলি সব সময়ই যে কোনও চুক্তির মোটা দিকগুলি নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে দেশের সরল অসংগঠিত মানুষদের বিভ্রান্ত করে থোকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে আশিয়ানভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য এক বছরের মধ্যেই দশ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু এ তো মিলিত বাণিজ্যের হিসাব দেওয়া হল — ভারতের বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রার হিসেব দেওয়া হল না কেন? থাইল্যান্ডের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সভাপতি মিঃ কিয়াট সিথিয়া মর্ন চুক্তির প্রায় পরে পরেই কলকাতায় এসে গত ১৭ আগস্ট '০৯ জানিয়ে গেছেন যে ভারতের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যের পরিমাণ ২০১০ সালের মধ্যেই একলাফে ৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে হবে ১০ বিলিয়ন ডলার। ভারতের বাণিজ্য কী বাড়বে? মনে হয় না। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা বলছে ২০০৪ সালে থাইল্যান্ডের সঙ্গে যে Early Harvest Programme (EHP) চুক্তি হয়েছিল তাতে কেবল থাইল্যান্ডই লাভবান হয়েছিল। ২০০৪-০৫ সালে থাইল্যান্ডে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯০১.৪ মিলিয়ন ডলার আর ২০০৭-০৮ সালে এই পরিমাণ বেড়ে হয় মাত্র ১.৮ বিলিয়ন ডলার। বিপরীত দিকে ভারতে থাইল্যান্ডের বাণিজ্যের পরিমাণ ২০০৪-০৫-এ ছিল ৮৬৫ মিলিয়ন ডলার আর ২০০৭-০৮-এ এই পরিমাণ ভারতের চেয়েও বেড়ে হয় ২.৩ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ থাইল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক অসাম্য আগে থেকেই রয়েছে। থাইল্যান্ডের মতো ছোট দেশের সঙ্গে যদি ভারতের বাণিজ্যিক ভারসাম্য না থাকে তাহলে আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য মানে যে শুধুই ভারতের সম্পদ লুণ্ঠিত হতে দেওয়া তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে ২০০৪ সালের চুক্তিতে কেবল ৮২টি পণ্যকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এবারের চুক্তিতে কিন্তু ছাড় দেওয়া হয়েছে ৪০০০টি পণ্যকে। এর মধ্যে ৩২০০ টি পণ্যের উপর থেকে আমদানী শুল্ক একেবারে তুলে দেওয়া হবে ২০১৩ সালের মধ্যে আর বাকি ৮০০টি পণ্যের উপর থেকে শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনা হবে ২০১৬ সালের মধ্যে। এর ফলে দেশীয় বাজার ভরে যাবে সস্তার বিদেশী পণ্যে আর দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পজাত পণ্য ক্রমশ বাজার থেকে হটে যাবে। কারণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতি সরকারের কোনও ভর্তুকি বা আর্থিক অনুদান প্রকল্প নেই। কেন্দ্রের কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বৃহৎ পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকার আর্থিক অনুদান দিয়েছে ও নানান ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের রপ্তানী বাণিজ্য ক্রমশঃ কমছে। এবছরের প্রথম তিনমাসে গত বছরের তুলনায় রপ্তানী কমে গেছে ৩১.৩ শতাংশ।

ইতিমধ্যেই দেশের বৃহৎ স্টীল প্রস্তুত কারক কোম্পানীগুলো আমাদের দেশীয় পণ্যকে এই মুক্ত বাণিজ্যের তালিকায় রাখার বিরোধিতা করেছে। তাদের মতে, Cold Rolled Steel তৈরি করতে লাগে Hot Rolled Coils (HRC)। এগুলি আগে থেকেই দক্ষিণ কোরিয়া, রশিয়া, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড এবং ইউক্রেন থেকে সস্তা দরে এদেশের বাজারে ঢুকতো। এদের চাপে এমনিতেই এদেশের পণ্য বিক্রি প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। দাবী উঠেছিল ড্রত্মট্ট বাইরে থেকে এলে তার উপর সরকার রক্ষাকবচ হিসেবে বাড়তি শুল্ক লেভি চাপাক। দুঃখের বিষয় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার লেভি চাপানো তো দূরের কথা, শুল্কহীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে বিদেশীদের সস্তায় বাণিজ্যের সুবিধা করে দিল।

বৈপরীত্য ভারতবর্ষের একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নীতি, আদর্শের ক্ষেত্রেও যখন এই বৈপরীত্য আমরা দেখি, তখন একটু অবাকই লাগে। এদেশে যে বা যারা নিজেদের নাস্তিক বলে প্রচার করে, তলে তলে তারা নাস্তিকদের চেয়ে বেশি ঈশ্বর বিশ্বাসী। আবার যে বা

(এরপর ১৪ পাতায়)

> **"একথা হলফ করেই তাই বলা যায় যে, এইসব মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সেপ্টে স্বরে দিল্লীতে সদস্য দেশগুলির সভা ডাকা এবং জেনেভায় দোহা আলোচ্যসূচীর অচলাবস্থা দূর করা — সবই আমেরিকার দাদাগিরিকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।"**

প্রশাসন নির্বিকার

বীরভূমে মূর্তি ভেঙেই চলেছে দুষ্কৃতীরা

বিশেষ সংবাদদাতা বীরভূম ।। বনেদি বাড়ির প্রাচীন মন্দিরের কালী মূর্তির মাথা ভেঙে দিল দুষ্কৃতীরা। জেলার দুবরাজপুর থানা এলাকার রঞ্জনবাজার অঞ্চলের এক প্রাচীন বনেদিবাড়ির কালী মূর্তিটি মুন্ডু ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান মন্দিরের পুরোহিত। গত ২৫ আগস্ট সন্ধ্যার পর মন্দিরে আরতি দিতে যান পুরোহিত। দেখেন মন্দিরের গেটের তালা ভাঙা, মা কালী মূর্তির মুণ্ডুও ভাঙা।

এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এই নিয়ে বীরভূম জেলা জুড়ে বেশ কয়েকটি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটল। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে জেলা প্রশাসন থেকে সংবাদমাধ্যম নীরব ভূমিকা পালন করে। পাছে উত্তেজনা ছড়ায়। দোষীদের খুঁজে বার করে উপযুক্ত শাস্তির বদলে এইসব ঘটনাকে জেলা পুলিশ ধামাচাপা দিতে বেশি ব্যস্ত। যেভাবে মন্দিরে এই ঘটনা ঘটেছে, সেই মন্দির কর্তৃপক্ষকে উল্টে ভয় দেখানো হয়েছে ঘটনা নিয়ে কোনও অভিযোগ না করা হয় বলে।

দুবরাজপুর শহরের বনেদি পরিবারের অন্যতম দত্ত -মুদী পরিবার। সেই পরিবারের পূর্বপুরুষ বিধূভূষণ দত্ত প্রায় ৭০ বছর আগে বাড়ির লাগোয়া ধানের মিলে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিশাল মিল চত্বরের বাউন্ডারী ঘেরা, তারই এক পাশে প্রাচীন কালীমন্দিরে নিত্য পূজা হয় মা কালীর। আজও সেই প্রথা অনুসারে দু'বেলা পুরোহিত পুজো করেন। প্রত্যেক অমাবস্যায় বিশেষ পুজো হয় বলে দত্ত- মুদী পরিবার সূত্রে জানা গেছে। এই কালী পূজা শুধু দুবরাজপুর শহরের সাধারণ মানুষ আসেন তা নয়, জেলা ও জেলার বাইরের বহু মানুষ আসেন। মানত করেন, মনস্কামনা পূরণ হলে বিশেষ পুজো দেন। দত্ত-মুদী পরিবারের বর্তমান শরিক সৌম দত্ত-মুদী বলেন, আমরা হতভম্ব। হিন্দু দেবীর মূর্তি ভাঙার এতবড় সাহস কাদের হতে পারে তাই ভেবে। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু দুবরাজপুর থানার পুলিশ একবার এসে দেখে যাওয়া ছাড়া কিছুই করেনি। আজও কোনও অপরাধী ধরা পড়েনি। এরই মাঝেএলাকার রাজনৈতিক দলের নেতারা মাঠে নেমে পড়েছে ঘটনাটা ধামা চাপা দিতে। অবশ্য বিজেপির সংগঠন সম্পাদক বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী বলেন, অবিলম্বে পুলিশ দোষীদের শাস্তি না দিলে জেলা জুড়ে তীব্র আন্দোলন হবে।

প্রতি তিনটি গ্রেনেডের একটা অকেজো

(১ পাতার পর)

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন সেনাকর্মীদের কথা হলো, কোনওদিনই এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল আর এস এন সিংহের বক্তব্য বেরিয়েছে India Defence Review পত্রিকায়। তিনিও বলেছেন, 'তিরিশ শতাংশ গ্রেনেড বিস্ফোরিত না হয়ে জওয়ানকে হতবুদ্ধি করে দেয়। কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অভিযানে একজন জওয়ান সর্বাধিক চারটি গ্রেনেড বহন করে থাকেন। নিদেনপক্ষে একটি গ্রেনেডও যদি কার্যকর না হয় তাহলেই সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ কর্ণেল (অবসরপ্রাপ্ত) ইউ এস রাঠোড় বলেছেন, 'ভারত এখনও সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার গ্রেনেডই ব্যবহার করে থাকে। যা এখন আর চলে না। উল্টো দিকে সন্ত্রাসবাদীরা অত্যাধুনিক বেলজিয়ান গ্রেনেড ব্যবহার করে, যা বিস্ফোরিত হতে মাত্র ২-৫ সেকেণ্ড সময় নেয়। ভারতীয় গ্রেনেড বিস্ফোরণ হতে চার সেকেণ্ড সময় নেয়।' অপরপক্ষে সেনাবাহিনী যে ইনসাস রাইফেল ব্যবহার করে তা দিয়ে গ্রেনেড লঞ্চারের কাজ হয় না। সেনাকে ৭.৬২ মিমি-এর পুরনো রাইফেলই ব্যবহার করতে হয়। এদিকে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশনের সময় ভারতীয় জওয়ানরা হাল্কা ইনসাস রাইফেল ১৯৯০ থেকে ব্যবহার করে আসছে। কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশনে তা অনেক সময়ই কাজে আসেনি। এছাড়া সন্ত্রাসবাদীরা সবসময়ই একে ৪৭ সিরিজের রাইফেল ব্যবহার করে। সেনাবাহিনীর বিভাগীয় মতে অস্ত্র ব্যবহার করা হয় শত্রুকে দুর্বল করার জন্য, হত্যা করার জন্য নয়। ইনসাস রাইফেলের ক্যালিবার অপেক্ষাকৃত ছোট। ব্যারেল অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়। চল্লিশ কেজি ওজনের বুলেট প্রুফ জ্যাকেট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা বেশ অসুবিধাজনক। সেনারা সন্ত্রাসীদেরকে আঘাত নয়, একেবারে সমূলে ধ্বংস করতে চায়। তারা বারবার নতুন আধুনিক অস্ত্র চাইছে। এছাড়া ওইসব রাইফেলে যে 'নাইট ভিশন' ব্যবস্থা থাকে তাও আশানুরূপ নয় বলে বাহিনীর জওয়ানদের অভিযোগ।

ইনসাস্-এর উপরে বিশ্বাস হারিয়ে অসুবিধা নিয়ে বারবার অভিযোগ করেছে জওয়ানরা। তারা চায় আরও উন্নত আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।

ঢাকায় দুর্গাপুজো বয়কট

(১ পাতার পর)

বাহিনী হামলা চালিয়ে অসমাপ্ত দুর্গা প্রতিমা ভেঙে দেয় এবং মন্দিরে রাখা পূজার বাসনপত্র লুঠ করে। মন্দিরে হামলা চালানোয় হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়ে পথ অবরোধ করে। বিষয়টি আদালতের নজরে আনা হয়। তখন জানা যায় যে জমির দলিল ও আদালতের দখলিনামা সবই জাল। এরপরেও স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন জালিয়াতদের ধরেনি। রংপুর দুর্গাপূজা কমিটির সভাপতি বনমালি পাল জানিয়েছেন এই ঘটনার পর দুর্গাপুজো করতে হিন্দুরা ভয় পাচ্ছেন।

ঢাকায় নিতাই দাসের পরিবারের ৯ জনকে অপহরণ এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবার পুজো বয়কট করার সিদ্ধান্তে আওয়ামি লিগ নেতাদের টনক নড়ে। অপহরণ ঘটনার পাঁচদিন পরে আওয়ামি লিগ সাংসদ মিজানুর রহমান দীপু জানান যে এই ঘটনার তদন্তে সি আই ডি-কে নামানো হয়েছে। সূত্রাপুর থানার তদন্তকারী অফিসার ফরমান আলিকেবদলি করা হয়েছে। এতসব বড় বড় কথা বললেও সাংসদ সাহেব একবারের জন্যও নিতাইবাবুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলার সময় পাননি। অতীতে বেগম জিয়ার সরকারের আমলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিজারাবাদে একটি হিন্দু পরিবারের ১১ জন সদস্যকে খুন করে মৃতদেহ ড্রামে পুরে গোর দিয়েছিল জমি মাফিয়ারা। যেহেতু দুষ্কৃতীরা ক্ষমতাসীন বি এন পি দলের ছত্রছায়ায় ছিল তাই সেদিন হিন্দুরা কোনও বিচার পায়নি। নিতাই দাসের পরিবারের উপর হামলার ঘটনায় তাই বাংলাদেশের হিন্দুরা আতঙ্কিত। তাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসতে চাইছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের কড়া নিষেধাজ্ঞার জন্য সীমান্ত পেরিয়ে এপারে আসতে পারছেন না। প্রাণ, মান, ইজ্জত বিসর্জন দিয়ে হিন্দুদের বাংলাদেশেই থাকতে হচ্ছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের রক্ষায় ব্যর্থ শেখ হাসিনা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে পদ্মার ইলিশ উপহার দিয়েছেন।

শুধু সন্দেহ বশেই মালদার গ্রামে হিন্দু হত্যা, বাড়িঘর পোড়ানো হল

সংবাদদাতা : মালদা ।। একটি মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে — এমন মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মনোজ মণ্ডল নামে একজন নির্দোষ হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা এবং ৬টি বাড়িতে লুঠ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে গেল। আর এতে উত্তাল হয়ে গেল মালদা জেলার ইংলিশবাজার শহর সংলগ্ন বাগবাড়ি এলাকা। গত ২৯ আগস্ট রাত্রে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে জামাইবাবুর সাথে বাড়ি ফেরার সময় নাকি ৬ জন দুস্কৃতী রোশনা খাতুন নামে এক তরুণীকে ধর্ষণ করে পাশের হিন্দু গ্রামে পালিয়ে যায়। এরপর শুরু হয় পথ অবরোধ। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুরের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হাজারখানেক মুসলিম হাসুয়া, বরশা, বোম, পিস্তল নিয়ে দলবদ্ধ ভাবে ৫২ বিঘা বিনপাড়াতে ৬টি বাড়িতে হামলা চালায়। জয়া মণ্ডল, তারাপদ মণ্ডল, ববি মণ্ডল, গোবিন্দ মণ্ডল, শ্রীপতি মণ্ডল, মণি মণ্ডলের বাড়ি গুড়িয়ে দেয়। সেইসঙ্গে বাড়িগুলি থেকে টি ভি, টিউবওয়েল, টাকা ও গহনা লুঠ করে নিয়ে চলে যায়। যদিও ডাক্তারি পরীক্ষায় মেয়েটির উপর ধর্ষণের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, দুদিন পরেও পুলিশ বা কোনও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি সেই পাড়াতে ঢুকে বাড়িগুলির ধ্বংসের ছবি তোলেনি বা তদন্ত হয়নি। কোনও সংবাদ মাধ্যমেই এই অত্যাচার ও লুঠের কোনও উল্লেখ নেই। পরের দিন রাজনৈতিক দলগুলি শান্তির জন্য মিটিং ডাকার পর নেতারা যখন চলে যায় তখনই মনোজকে হত্যা করা হয়।

মজুতদারীতে মদত দিচ্ছে সরকার

(১ পাতার পর)

চালান করে দেওয়া হয়। এবার একেই আলুর ফলন কম হয়েছে, তার ওপরে দরদ দেখাতে গিয়ে বেশ অনেকটা পরিমাণ আলু রপ্তানি করা হয় উত্তরপ্রদেশে। এখন সাপের ছুঁচো গেলার মতো সেই আলুই ফেরত আনতে হচ্ছে এ রাজ্যে। এর ফলে পরিবহন খরচও যুক্ত হচ্ছে আলুর দামের সঙ্গে। সেই সাথে কৃষির বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, হুগলি জেলার চাঁপাডাঙ্গায় প্রস্তাবিত আলু বীজ গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে চাষীদের আর বেশি দাম দিয়ে হরিয়ানা, পাঞ্জাব থেকে চড়া দূরে বীজ কিনতে হতো না। ফলে আলুর উৎপাদন মূল্যও কম পড়ত।

এই মুহূর্তে চিনির দাম বাড়ছে আর্ন্তজাতিক বাজারেও। ব্রাজিলের পর সবচেয়ে বেশি চিনি উৎপাদন হয় এদেশেই। সুতরাং এখানে চিনির দাম বাড়াটা কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে অনেক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের কপালেই। এর একটা কারণ অবশ্যই এবারের খরাতে মার খেয়েছে খরিফ জাতীয় শস্যের উৎপাদন। এর দ্বিতীয় কারণটা কিন্তু সরকারি অপদার্থতা। গত ২০০৮-এর গোড়াতে এন সি ডি ই এক্স-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কলকাতা মুম্বই দিল্লীতে কুইন্টাল প্রতি চিনির দাম ছিল ১,৪৬৬ টাকা, ১৩৭৬ টাকা এবং ১৪৪০ টাকা। অক্টোবর মাসে এই দামটাই বেড়ে হয় কলকাতা, মুম্বাই ও দিল্লীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৮৬৭টাকা, ১৭৫৫টাকা এবং ১৮৫০ টাকা। দামবৃদ্ধির এই সূচকটা ধরে কেন্দ্রীয় সরকার যদি উৎপাদিত সব আখকেই চিনি শিল্পে ব্যবহারের ব্যবস্থা করতেন তাহলে এই হারে মূল্যবৃদ্ধিটা হয়ত ঠেকানো যেত। অন্তত বিশেষজ্ঞদের মত এটাই।

কোনও দলই সঙ্ঘের শত্রু নয়

(১ পাতার পর)

নয়। আবার খুব ঘনিষ্ঠও নয়। গত ৬ সেপ্টেম্বর গুজরাট ভ্রমণে এসে গান্ধীনগরে তিনি এই মন্তব্য করেন। এদিনই তিনি তিনদিনের সফরে গুজরাটে পৌঁছে আর এস এর স্বয়ংসেবকদের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি পরিস্কার জানান, কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গুজরাটে আসেননি। যখনই নতুন কেউ সঙ্ঘপ্রধান বা সরসঙ্ঘচালক হন তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হতে, কথাবার্তা বলতে দেশের বড় বড় রাজ্যে সফর করেন। এটা একটা প্রথা বা পরম্পরা।

প্রসঙ্গত, মোহনজী গতবছরই সরসঙ্ঘচালক হয়েছেন। এদিনকার এক ঘন্টা ব্যাপী ভাষণে তিনি স্বয়ংসেবকদের সামনে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেননি বা মন্তব্য করেননি। বলেছেন, সঙ্ঘ বিজেপির নিজস্ব ব্যাপারে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করে না। তিনি বলেন, সঙ্ঘ কারও প্রতি ধর্মমত বা জাতপাতের কারণে কোনও ভেদাভেদ করে না। শ্রীভাগবত আরও বলেন, হিন্দুস্থানে যারাই বসবাস করে, তারাই হিন্দু, তা তাদের জাত-পাত, পূজা পদ্ধতি যাই হোক না কেন। যে কেউ সঙ্ঘে স্বাগত। যদি কারুর সঙ্ঘের আদর্শ পছন্দ না হয় তাহলে তিনি তা ছেড়ে যেতে পারেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, পশ্চিমী সংস্কৃতি ভারতীয় পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই নয়, খাপ খায় না। হিন্দু সংস্কৃতির শিক্ষা হল — সহিষ্ণুতা এবং অন্য মতামতকে সহন করা বা গ্রহণ করা। আর এস এস প্রধান এদিন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামকে উদ্ধৃত করে বলেন, সকল ভারতবাসীকে হাজার বছরের দাসসুলভ মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে উত্তরণের জন্য মহাশক্তির আরাধনা করতে হবে।

সমাবেশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেল এবং রাজ্য বিজেপি'র সভাপতি পুরুষোত্তম রূপালা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য রাজনীতি

পাপ চাপা থাকবে না

নিশাকর সোম

গত সংখ্যার লেখাতে বৈদিক ভিলেজ (বেদিক) সম্পর্কে কিছু না লেখাতে পাঠকের মনে হয়তো একথা উঠতে পারে যে, এ ব্যাপারে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনা তা নয়। এ-সম্পর্কে প্রায় সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে খবরা-খবর বেরিয়েছিল — তাই যেখানে দৈনিক শেষ করেছে সেখানেই সাপ্তাহিক শুরু করতে চায়। এই কান্ডের নায়ক হিসাবে গফ্‌ফর-এর নাম উঠেছে। তিনি পলাতক। এই গফ্‌ফর নাকি প্রথমে সিপিএমের জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন। পরে লোকসভার নির্বাচনে সিপিএম-এর বিপর্যয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন।

প্রথমেই একটা কথা বিনীতভাবে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রাজারহাটের জমি অধিগ্রহণ — যেটা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে পরিমাণে অনেক বেশি, সেখানে কোনও বিরোধী শব্দ উচ্চারিত না হওয়া কারণ সম্পর্কে এই কলামে লেখা হয়েছিল যে বিরোধী দলগুলির "স্বার্থ" রক্ষার কারণে সেখানে নিঃশব্দ জমি দখলের বিপ্লব হয়েছিল। প্রসঙ্গত, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে আলোচনায় যখন বুদ্ধ বাবু কোণঠাসা, যখন মমতা ব্যানার্জি অনশনে, তখন বারবার আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেবের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর যোগাযোগের কথা দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। বৈদিক ভিলেজের জন্য এক হাজার একর জমি দেওয়া হয়েছে। এই ভিলেজটির তিন দিকে ঘেরা, পিছনের দিক খোলা। পিছন খুলে রাখার কারণ ক্রমশ জমির ব্যাপ্তি বাড়ানো। এই ভিলেজটিকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য করা হচ্ছে বলে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। শোনা যাচ্ছে এই ১০০ একর জমি মন্ত্রী ডঃ দেবেশ দাস-এর দপ্তরের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে — যাতে সেখানে আই টি সেক্টর নাকি গড়া হবে?

> **"কোনও কোনও মহলের প্রচার এর সঙ্গে নাকি জনৈক প্রাক্তন সাংসদ জড়িয়ে আছেন? কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরোবে। কাজেই খোঁড়াখুড়ি কি হবে তা তো অনুমান করা যায়। সিপিএম পার্টি নেতৃত্ব এবং সিপিএম-এর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জনগণের আস্থা নেই। তাঁদের পচনের গন্ধে রাজ্য বিষাক্ত হচ্ছে। এই মৃতদেহগুলিকে সৎকার করাটাই শ্রেয়।"**

এই ভিলেজের জমির মধ্যে সরকারের খাস জমিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে! এ কাজ তো রাজ্যের ভূমি এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রকের কাজ। যে দপ্তরের মন্ত্রী হলেন আবদুর রেজ্জাক মোল্লা। যিনি সুভাষ চক্রবর্তীর মতো প্রকাশ্যে পার্টি নীতি ও পার্টি নেতাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে চলেছেন। এহেন রেজ্জাক মোল্লা বলছেন খাস জমি দেওয়াটার মধ্যে কোনও বেনিয়ম নেই। এত বিরাট পরিমাণ জমি একটা সংস্থা পায় কি ভাবে? এই প্রকল্পের সঙ্গে কমল গান্ধি, রাজকিশোর মোদি এবং পীযূষ ভগৎ জড়িত। এঁরা সিপিএম মন্ত্রী, নেতাদের খুশী করবার জন্য সবকিছু করে দেন। মন্ত্রী রেখা গোস্বামী আয়োজিত স্বনির্ভর মেলা তাঁদের জমিতে করার ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং সমস্ত সামগ্রী কিনে নেন। পরে তিনি সরে যান - যেখানে এখন নাকি জনৈকা কর্ত্রী?

শুধু দু'জন মন্ত্রী অর্থাৎ গৌতম দেব এবং রেজ্জাক মোল্লা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তাই নয়। নানান খবরের মধ্যে ভাঙড়ের তৃণমূল বিধায়ক আরাবুলের নামও দেখা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী রেলমন্ত্রী মমতার বক্তব্য হল — "আরাবুলকে বারবার মন্ত্রী গৌতম দেব ডেকে পাঠাতেন, আমি আরাবুলকে যেতে বারণ করি।" শুধু আরাবুল নয় তৃণমূল নেতা তন্ময় মন্ডলের নামও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, এবং অত্যন্ত আশ্চর্য যে মমতা ব্যানার্জি কথায় কথায় সিবিআই তদন্তের কথা বলতেন, তিনি এখানে সিবিআই তদন্ত চাননি। তিনি খালি থানা ঘেরাও-এর কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। আর তৃণমূলের অঘোষিত দৈনিকেও বৈদিক ভিলেজ প্রথম পাতার লিড নিউজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

এদিকে মন্ত্রী গৌতম দেব প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে — "এ ব্যাপারে পার্টি এবং সরকারকে সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।" আশ্চর্য, গৌতমবাবু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অর্থাৎ পার্টির কর্তা এবং মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেববাবু পুলিশকে রঙ না দেখে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সিবিআই তদন্ত চেয়েছে।

এই ভিলেজটি উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত। সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু পার্টির উত্তর ২৪ পরগনা নেতৃত্বকে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্বের মধ্যে আছেন রাজারহাট অঞ্চলের বিধায়ক রবীন মন্ডল, গৌতম দেব ও (জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য) তাপস চ্যাটার্জি, (পুরপ্রধান এবং জেলা কমিটির সদস্য)।

কোনও কোনও মহলের প্রচার এর সঙ্গে নাকি জনৈক প্রাক্তন সাংসদ জড়িয়ে আছেন? কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরোবে। কাজেই খোঁড়াখুড়ি কি হবে তা তো অনুমান করা যায়। সিপিএম পার্টি নেতৃত্ব এবং সিপিএম-এর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জনগণের আস্থা নেই। তাঁদের পচনের গন্ধে রাজ্য বিষাক্ত হচ্ছে। এই মৃতদেহগুলিকে সৎকার করাটাই শ্রেয়।

বৈদিক (বেদিক) ভিলেজ নিয়ে মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তা থেকে জানা যায় সরকারি খাস জমি কম দামে বা জলের দামে লিজ দেওয়া হয়েছে। আরও ঘটনা হল রেজ্জাকের কথায় জানা যাচ্ছে, মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি খাস জমির উপর বাড়ি তৈরি করেছেন?

এই ভিলেজের রিসর্টে বহু মান্যগণ্য ব্যক্তির নাকি যাতায়াত ছিল। এ সম্পর্কে রেজ্জাক বলেছেন, তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করাতে যেতেন। কোনও ফি লাগতো? তিনি

(এরপর ৭ পাতায়)

অন্য রকম

সংগ্রহী পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। তাঁরা সকলেই সংগ্রহকারী। জীবনে সকলেই কিছু না কিছু সংগ্রহ করেছেন। হাতের কাছে যা পেয়েছেন, তাই যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। 'যাকে রাখি সেই রাখে' নীতি মেনেই আজ তাঁদের ভাণ্ডারে জমে উঠেছে হরেক দুর্লভ সামগ্রী। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিওরের এইচ বি মহেশ্বরীর পরিবার শুধু সুখী পরিবার নয়, একটা বিশাল বড় সংগ্রহশালাও বটে। হরেক সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখার নেশাটা শুধু মহেশ্বরীবাবুর একার নয়, তাঁর স্ত্রী, কন্যা, পুত্রও পেয়েছে বাবার স্বভাব। পরবর্তীতে মহেশ্বরী পরিবারে এসে পুত্রবধূও শিখে গেছেন দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করে রখার কৌশল। মহেশ্বরীবাবুর খুদে নাতিও ছোটো থেকেই হাত পাকাচ্ছে একাজে। এইচ বি মহেশ্বরীর সংগ্রহের তালিকায় কি নেই! প্রস্তর ও তাম্র যুগের মুদ্রা থেকে, হালের হরেক পলিথিন ব্যাগও রয়েছে তাতে। তবে এই সংগ্রহ শুধু একার নয়। পরিবারের সকলে মিলে গড়ে তুলেছেন তাঁদের স্বপ্নের সংগ্রহশালা। সংগ্রহের কাজেও এক একজন একেক বিভাগে বিশারদ।

মহেশ্বরীবাবু তাঁর ৬২ বছরের জীবনে সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা। তাম্র থেকে স্বর্ণ মুদ্রার বিশাল সংগ্রহ রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। রাজা-মহারাজাদের আমলের মুদ্রাও রয়েছে তাতে।

মহেশ্বরীবাবুর স্ত্রী কিরণ বেলার সংগ্রহে রয়েছে টিকিটের সম্ভার। বিভিন্ন সময়ের ডাক টিকিট সংগ্রহ করেছেন কিরণ দেবী। সংসারে পাঁচ কাজ সামলেও সংগ্রহ ক রেছেন এসব। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে কিরণ দেবীর ডাক পড়ে। জনমানসে সেসব টিকিট বেশ সমাদৃতও হয়।

ছেলে নীলকমলও বাবা-মা'র মতো নিজের সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন। তাঁর সংগ্রহ সম্ভারের মধ্যে রয়েছে গুণী-মানীদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ছবি, অটোগ্রাফ। প্রাক্তন থেকে বর্তমান রাষ্ট্রপতিরও বিভিন্ন সময়ের দুর্লভ সব ছবি নীলকমল ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে ফেলেছেন। ওয়েবসাইট থেকেও বিভিন্ন ছবি নিজের সংগ্রহশালায় তুলে রেখেছেন তিনি। দলাই লামা থেকে দেব আনন্দের হস্তলিপিও রয়েছে তাঁর কাছে। শুধু তাই নয়, মহাত্মা গান্ধীর সেই খাদিও রয়েছে মহেশ্বরীবাবুর সংসারে। মেয়ে কামাক্ষীও বাদ নেই পরিবারের এই হবি থেকে। ইতিমধ্যেই তিনি সাড়ে তিন হাজার পলিব্যাগ সংগ্রহ করেছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন সাইজের পলি ব্যাগ রয়েছে তাঁর কাছে। নীলকমলের স্ত্রী অর্থাৎ মহেশ্বরী পরিবারের পুত্রবধূরও সংগ্রহে রয়েছে দুর্লভ সামগ্রী। দেশ-বিদেশের প্রিপেড ফোন-কার্ড সংগ্রহ করেছেন তিনি।

সমগ্র পরিবারের এই সংগ্রহ মহেশ্বরী পরিবারের মুখ আরও উজ্জ্বল করেছে। জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন মহেশ্বরীবাবু নিজে। বাকীদের ভাণ্ডারেও রয়েছে ছোট বড় প্রাইজ। সেই সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশীর হাঁক-ডাকও কম নেই।

মহেশ্বরীবাবুর সংগ্রহী পরিবার।

উত্তর দিনাজপুরে শিক্ষকের অভাবে স্কুলশিক্ষা বেহাল

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৫৪টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। এর মধ্যে ৯টি বিদ্যালয় হবে অলচিকি ভাষার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বলে জানা গেছে।

খবরে প্রকাশিত যে, সম্প্রতি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই অনুমোদনের কথা জানিয়ে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদ্যালয়গুলি চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে পড়ার জন্য বিদ্যালয়গুলি আগামী বছর থেকে আদৌ চালু করা যাবে কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ অবশ্য জানিয়েছে যে, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে জেলায় মোট ১৪৫৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এই জেলার বহু গ্রামেই এখনও কোনও বিদ্যালয় নেই। সেখানকার ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার জন্য অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে যেতে হয়। এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ জানিয়েছে যে, জেলায় বিদ্যালয়হীন গ্রামের সংখ্যা ১১৬টি। যে ৫৪টি বিদ্যালয়ের অনুমোদন এসেছে, সেগুলি এই বিদ্যালয় - বিহীন গ্রামগুলিতে তৈরি করা হবে।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি উৎপল দত্ত বলেন যে, আমরা ১০০টি বিদ্যালয়ের জন্য রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র ৫৪টির অনুমোদন এসেছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হয়েছে যে, এই জেলার গোয়ালপোখর ১ নং ব্লকে ১৬টি, চাকুলিয়ায় ৭টি এবং করণদিঘীতে ১৫টি বিদ্যালয় করা হবে। এছাড়া জেলার ৯টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে জনজাতি সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি করে বিদ্যালয় করা হবে। সেখানে কেবল অলচিকি ভাষায় পড়াশুনা হবে। আর বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলির জন্য ৯০ জন এবং অলচিকি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলির জন্য ১৮ জন শিক্ষক- শিক্ষিকার জন্য অনুমোদন দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ের জন্য গ্রামে গ্রামে জমি খোঁজা শুরু হয়েছে। অনেক গ্রামে বিদ্যালয়ের জন্য ১০ কাঠা করে জমি সরকারকে দান করার জন্য গ্রামবাসীদের কাছে আবেদন করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই বিদ্যালয়গুলি চালু করা হবে।

কিন্তু জেলার শিক্ষকমহল বিদ্যালয়গুলি চালু হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। তারা বলছে যে, বর্তমানে চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেই পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় পড়াশুনা লাটে উঠেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়াও ঝুলে রয়েছে। এই অবস্থায় এতগুলি নতুন বিদ্যালয় হলে, সেখানে শিক্ষক কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সংসদের সভাপতি অবশ্য বলেন যে, শিক্ষক পেতে কোনও সমস্যা হবে না। বিদ্যালয় সঠিক সময়েই চালু করা যাবে।

এদিকে জেলার ওয়াকিবহাল মহল এই অভিমত প্রকাশ করেছে যে, রাজ্য সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকতে এই নতুন বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন দিয়ে জেলার মানুষকে আবার বোকা বানানোর অপচেষ্টা করছে। কিন্তু অনুমোদনকৃত এই বিদ্যালয়গুলি আদৌ কোনওদিন চালু হবে কিনা, সে নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এক মহলের এই অভিমত যে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে হয়তো এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের পরে এই প্রকল্প হয়তো ঠাণ্ডা ঘরে চলে যাবে।

অসমে ২৯টি জেহাদি সংগঠন সক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গুয়াহাটিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে অবৈধ বাংলাদেশীদের অসম থেকে বিতাড়নের দাবী জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সভাপতি জ্যোতিষ পাঠক এবং মুখপাত্র নয়নরঞ্জন বরুয়া। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা অসমে সক্রিয় ২৯টি মুসলিম মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা তুলে দিয়েছেন এবং তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে উদ্ধৃত করেই। উল্লেখ্য, কদিন আগেই সি আর পি এফ-এর পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকারকে জানানো হয়েছে যে বৃহত্তর মুসলিম বাংলাদেশ গঠনের চক্রান্ত ও পরিকল্পনার কথা। সেই তালিকায় নাম রয়েছে —

(১) মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগার্স অফ্ অসম (মুলটা) (২) হরকত উল মুজাহিদিন (এইচ ইউ এম)। (৩) মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম (এম ইউ এল এফ এ)। মুসলিম লিবারেশন আর্মি (এম এল এ)। (৫) মুসলিম ভলেন্টিয়ার ফোর্স (এম ভি এফ)। (৬) ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিবারেশন আর্মি অফ অসম। (৭) লিবারেশন ইসলামিক টাইগার ফোর্স (এল আই টি এফ)। (৮) ইসলামিক সিকিউরিটি ফোর্স অফ্ ইন্ডিয়া (আই এস এফআই)। (৯) জামায়াত-এ-ইসলামি অসম ইউনিট (জে ই আই)। (১০) ইউনাইটেড সোসাল রিফর্ম আর্মি। (১১) ইসলামিক সেবা সঙ্ঘ (আই এস এস)। (১২) ইউনাইটেড রিফর্মেশন প্রোটেস্ট অফ্ অসম (ইউ আর পি এ)। (১৩) স্টুডেন্টস্ ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি)। (১৪) পীপুলস্ ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (পি ইউ এল এফ)। (১৫) স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন (এস আই ও)। (১৬) ইসলামিক লিবারেশন আর্মি (আই এল এ)।

এছাড়া আরও নাম রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে ২৯টি মৌলবাদী ইসলামি গোষ্ঠীর নাম রয়েছে। আরও ভয়াবহ হলো, উত্তর পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে আই এস আই (পাক গোয়েন্দা সংস্থা), ইসলামি ছাত্র শিবির (বাংলাদেশ ভিত্তিক জামাতে ইসলামির ছাত্র সংস্থা), সিপাহি সাহেবা এবং আল কায়েদার মতো জঙ্গি সংগঠনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ভিত্তিক ইসলামি সংস্থাগুলো অসমে জেহাদ ও ভারত বিরোধী প্রচার চালাতে দারুণ সক্রিয়।

এইসব উল্লেখ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সরকারকে এইসব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবী জানিয়েছে।

আগাথার আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। উত্তর পূর্বাঞ্চলে গ্রামীণ উন্নয়ণের জন্য বরাদ্দ অর্থের যথাযথ সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজরদারি (মনিটরিং) করার কথা বললেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আগাথা সাংমা। প্রসঙ্গত, আগাথা মেঘালয় থেকে গত সংসদীয় নির্বাচনে জিতে সর্বকনিষ্ঠা সাংসদ হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁর রক্তেই রয়েছে রাজনীতি। তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি এ সাংমার কন্যা। ব্যক্তিগতভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখে তিনি কেন্দ্রীয় তহবিল খরচের বিষয়ে দেখভাল ও খোঁজখবর করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি প্রকল্পের সত্বর অগ্রগতি আপনিও নিশ্চয়ই চান। সুতরাং কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের ওই সব প্রকল্পে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য দিলে এবং খোঁজ-খবর করলে ভালো হয়। তিনি আরও বলেছেন, আমি আপনাদের ব্যক্তিগত ভাবে দেখাশোনা এবং সহযোগিতার পক্ষপাতী। প্রকল্প রূপায়িত

আগাথা সাংমা

হলে দ্রুত উন্নয়ণ সম্ভব। এজন্য সময়ে সময়ে কাজের অগ্রগতির বিষয়ে তাঁকে জানালে ভালো হয় বলে আগাথা সাংমা চিঠিতে জানিয়েছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, অসম এবং অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়ণ প্রকল্পের শম্বুকগতি ও বরাদ্দ অর্থ সময়মতো খরচ করতে না পারার অভিযোগ সাম্প্রতিক অতীতে বার বার উঠেছে।

জনজাতিদের জমি রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অল অসম ট্রাইব্যাল সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক গত ৩১ আগস্ট গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে অসমে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং জনজাতিদের জায়গা-জমি সুরক্ষিত রাখার দাবী জানিয়েছেন। ট্রাইব্যাল সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক আদিত্য খাকলারির অভিযোগ, অসম ভূমি-রাজস্ব আইনের দশ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে জনজাতিদের জমি-জায়গা অন্যদেরকে হস্তান্তর করা চলছে। তাঁর আরও বক্তব্য, জনজাতিদের জমি অ-জনজাতিদেরকে প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অসম ভূমি-রাজস্ব আইনের দশ নং অনুচ্ছেদে জনজাতিদের জমি-জায়গা সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। ট্রাইব্যাল সঙ্ঘ আরও শক্তিশালী আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনকে উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠনের কথা বলেছেন আদিত্য খাকলারি। ওই কমিটিতে জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত এম এল এ, এম পি, স্বশাসিত এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং ট্রাইব্যাল সঙ্ঘের প্রতিনিধিকে সম্মিলিত করার কথাও রয়েছে। অসমে নেপালি ভাষায় পড়াশোনার সুযোগ শীঘ্রই রাজ্য সরকার ব্যবস্থা করছে বলে খবর।

অসম-নাগাল্যাণ্ড সীমান্তে চলছে অবৈধ ব্যবসা

সংবাদদাতা ।। অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তের গোলাঘাট জেলার সরুপাথর থানার বিদয়াপুর বাজার উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বাংলাদেশের অবৈধ ব্যবসা বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। ওখানে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের যাতায়াত এবং বসবাসের নিশ্চিত খবর পাওয়া গেছে। সাধারণত বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা বিদয়াপুর বাজারে বেআইনীভাবে মালপত্র বেচা-কেনার পর ওই এলাকার সিতোনাপুর এবং লাখিপুরে বহাল তবিয়তে বসবাস করে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডের ব্যবসায়ীরাও ডিমাপুর এবং বোকাজান রেলপথ ব্যবহার করে ওখানে যাতায়াত করে।

এক বিশ্বস্ত সূত্র মতে ওই বাজারে যে সকল জিনিসপত্রের বেচা-কেনা হয় তার মধ্যে রয়েছে— অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, মাদক দ্রব্য, ড্রাগ, জাল নোট, নারী এবং নিষিদ্ধ জীব-জন্তুও। এছাড়া বেআইনীভাবে মোটা মোটা কাঠের 'লগ' বিক্রি ওই বাজারের অন্যতম আকর্ষণ। বাজারের বেশ কয়েকটি পি সি ও রয়েছে যোগাযোগের জন্যে। সূত্রমতে কয়েকটি মার্কামারা কোম্পানীর অবৈধ ওষুধ ওখানেই বিক্রি হয়ে থাকে। বর্ডার সেক্টর বর্ডার ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতিরেকেই কাজ চালাচ্ছে। এটা গুরুতর আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যাপার। এমনকী বনদপ্তরও অবৈধ কাঠ-ব্যবসার বিষয়ে একেবারেই নিরুত্তাপ, চুপচাপ। বাংলাদেশী এবং বিভিন্ন নাগা-গোষ্ঠীর যাতায়াতের ফলে যে কোনও রকম অন্তর্ঘাতের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এসব জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ। সব মিলিয়ে ওই সীমান্ত এলাকায় অসমীয়াদের অস্তিত্ব এখন সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে অসম এবং নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীরা একসঙ্গে বসে দু'প্রদেশের যৌথ অভিযানের কথা চূড়ান্ত করেছিলেন। মাঝে মাঝে রেড করার কথা থাকলেও তা বোধহয় খাতায় কলমে থেকে গিয়েছে। সীমানা নিয়ে দু'প্রদেশের মধ্যে লিখিত চুক্তি নাগাল্যান্ড সরকার বারবার লঙ্ঘন করেছে। কেন্দ্র এ বিষয়ে এখনও অবধি কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরে যেমন প্রচুর সংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠী রয়েছে, তেমনই তাদের শিবির ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে বাংলাদেশে। ফলে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের সম্ভাবনা দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না।

উমরাংশুতে পরাবর্তন

সংবাদদাতা ।। দক্ষিণ অসমের উত্তর কাছাড় জেলার উমরাংশু শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে কপিলি চা বাগানের ছয় জন জনজাতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে গায়ত্রী যজ্ঞের মাধ্যমে নিজ প্রাচীন হিন্দু ধর্মে ফিরে এসেছে। তারা খুবই আনন্দিত হয়ে বলছেন, 'আমরা এখন ভুল পথ ত্যাগ করে নতুন জীবন ফিরে পেলাম।' এই শুভ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে শুদ্ধি করণ করে প্রত্যেককে গীতা দান করা হয় এবং সকলকে ভারতমাতার লকেট উপহার দেওয়া হয়।

এদের মধ্যে ৩ জন মহিলাকে ১টি করে শাড়ি দান করেন উত্তর কাছাড় জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ছাত্রাবাস প্রধান। উপস্থিত প্রায় দু'শোজন নাগরিকের মধ্যে যজ্ঞের প্রসাদ ও খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। ওই চা বাগানের ম্যানেজার তিওয়ারি মশায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আহ্বায়ক ছিলেন কপিলি চা বাগানের সর্দার হরি গোয়ালা ও পরিষদের স্থানীয় কর্মীরা।

মুসলিম তোষণে নিশ্চিন্ততার আভাষ। চলছে মিষ্টিমুখ।

ভোটের মুখে মহারাষ্ট্রে নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তে না পড়তেই রাজ্যের শাসক দল শুরু করেছে নগ্ন মুসলিম তোষণ। ইতিপূর্বে ওই রাজ্যের মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (এম ডি ডি) এই বছরের বাজেটে মুসলিমদের জন্য অতিরিক্ত দেড়শ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ দাবী করেছিল সরকারের কাছে। তাদের ওই দাবী অনুযায়ী মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং এন সি পি দ্বারা গঠিত ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ডি এফ) সরকার শেষ পর্যন্ত ওই বিপুল পরিমাণ টাকা সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ করেছে। প্রসঙ্গত, গতবারের বাজেটে মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ ১৬৭ কোটি টাকা থেকে মাত্র ৫৭ কোটি টাকা সরকার খরচ করতে পেরেছিল। ফলে সেই অতিরিক্ত ১১০ কোটি টাকাও যুক্ত হয়েছে এবছরের বাজেটে বরাদ্দ দেড়শ কোটি টাকার সঙ্গে। সব মিলিয়ে ভোটের আগে ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতে ওই দু'শো ষাট কোটি (১৫০+১১০) টাকা মুসলিমদের জন্য তড়িঘড়ি কাজে লাগাতে তৎপর হয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার।

গতবারের রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ করা ১১০ কোটি টাকা ব্যয় না করতে পারার অপরাধ যে ডি এফ সরকারকে তাড়া করবে — এবারের বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে এমন হুমকিটাই কিন্তু দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের সংখ্যালঘু উন্নয়ণ মন্ত্রী আনিস আহমেদ। আহমেদের বক্তব্য ছিল — 'মুসলিমদের মধ্যে প্রভূত ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। একবার তাদের হাতে টাকা পৌঁছলে সেই ক্ষোভ অনেকটাই প্রশমিত করা যাবে।" আনিস আহমেদের কথায় হঠাৎই যেন সম্বিৎ ফিরে পায় মহারাষ্ট্র সরকার। কারণ বিগত দশ বছর ধরে একের পর এক প্রশাসনিক অপদার্থতা, কৃষি ক্ষেত্রে পরের পর মৃত্যু সরকারের আসন বেশ টলোমলো করে দিয়েছিল। সুতরাং ভোট ব্যাঙ্ক রক্ষার তাগিদে এখন মুসলিমদের ঘুষ দিতে হবে বইকি! এমনকী ডি এফ সরকারের অন্দরমহল থেকে এখন এই আওয়াজও উঠছে যে এবারে সদ্য-সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট তাদের পক্ষেই রায় দিয়েছে। সুতরাং মহারাষ্ট্রের ১৩ শতাংশ মুসলিম ভোট ডি এফ-এর পক্ষে থাকলে বাকি ৮৭ শতাংশ ভোটকে আর পাত্তা না দিলেও চলবে। সরকারের অন্দরমহলের যুক্তিটা হলো, এবারে লোকসভায় মুম্বাই-এর উপকণ্ঠে মাভাল কেন্দ্রে এন সি পি-র আজাম পানসারা ২ লক্ষ ৮০ হাজার ভোট পেয়েছেন, যেখানে সমাজবাদী পার্টির আবু আসিম আজমি মাত্র ৮৪ হাজার ভোট পান। সুতরাং নির্বিচারে চালাও মুসলিম তোষণ! প্রসঙ্গত, এই মুসলিম তোষণের কাঁধে ভর করেই লোকসভায় কংগ্রেস ১৭টি এবং এন সি পি ৮টি আসন পায় এই রাজ্যে।

তবে এই নগ্ন মুসলিম তোষণ-এর একটি জবরদস্ত অজুহাত কিন্তু পেয়ে গেছে মহারাষ্ট্রের ডি এফ সরকার। সেই অজুহাতটি হলো সাচার কমিটির রিপোর্ট। রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান নাসেম সিদ্দিকি বলেছেন, ''সাচার কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী এই রাজ্যে দলিতদের চাইতেও মুসলিমদের অবস্থা খারাপ। সুতরাং তাদের উন্নতি করার জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা তো নিতেই হবে।" সরকারকে চাপে ফেলতে সিদ্দিকির বক্তব্য, এক যুগ ধরে মুসলিমদের উন্নতিকল্পে কোনও পদক্ষেপই নেয়নি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। মুসলিম অধ্যুষিত মালেগাঁও-এর এক মুসলিম মৌলবাদী নেতা ইসমাইলের বক্তব্য, ''সরকার অঙ্গীকার করেছে সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিমদের জন্য পনেরো দফা দাবী কার্যকর করবে। কিন্তু এখনও কাজের কাজ কিছুই হয়নি''। বোঝাই যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রে আগামীদিনে সরকারের ওপর আরও চাপ বাড়বে মুসলিমদের। আর তাদের দাবী মানতেই থাকবে সরকার। কারণ ভোট আর তার ফলে পাওয়া ক্ষমতা যে বড় বালাই।

মিশন মুসলিম ভোট

মহারাষ্ট্র সরকারের ঘোষণা করা মুসলিমদের জন্য বরাদ্দের মোট দু'শো ষাট কোটি টাকা কি খাতে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে তার একটি বিবরণ পাওয়া যাবে নীচের সারণীতে।

মিশন মুসলিম ভোট

(১) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ মহিলা যাঁরা পরীক্ষায় সত্তর শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছেন তাঁদের স্কলারশিপের জন্য ধার্য ব্যয়-বরাদ্দ — ২২ কোটি টাকা।
(২) পেশাদারী কোর্সে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য — ৩০ কোটি টাকা।
(৩) অন্যান্য কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য — ৩৬ কোটি টাকা।
(৪) মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সৌন্দর্যায়ন-এর জন্য — ১২ কোটি টাকা।
(৫) ছাত্রীদের ভোকেশনাল কোর্সের জন্য — ২৫ কোটি টাকা।
(৬) আমদানী, রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঋণ — ৪২ কোটি টাকা।
(৭) নারী স্বনির্ভর যোজনা — ৫ কোটি টাকা।
(৮) অন্যান্য খাতে — ৮৮ কোটি টাকা।

বি. দ্র. — উপরিউক্ত প্রত্যেকটি যোজনাই যে মুসলমানদের জন্য এবং তার ব্যয় বরাদ্দও করেছে রাজ্য সরকার তা বলাই বাহুল্য।

উত্তরাখন্ডের জন্য বিপুল বরাদ্দ যোজনা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগামী বছরের যোজনায় উত্তরাখন্ড পেতে চলেছে প্রায় ৫৫৭৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এমনটাই ঘোষণা যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার। গত ৩১ আগস্ট দিল্লীতে উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়ালের সঙ্গে মিলিত হয়ে একথা জানান শ্রীআলুওয়ালিয়া। একই সাথে ওই যোজনায় আরও অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় আসন্ন কুম্ভমেলার পরিকাঠামো উন্নয়ণ খাতে। প্রসঙ্গত, গতবারের তুলনায় এবারে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে উত্তরাখন্ডের জন্যে।

এই বিপুল বরাদ্দে স্বভাবতই খুশী মুখ্যমন্ত্রী পোখরিয়াল নিশাঙ্ক বলেছেন, ''জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে পৌঁছনোর চেষ্টা করব। তবে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে সামাজিক বিকাশে এবং সেই সাথে পরিবহন ক্ষেত্রে।"

রমেশ পোখরিয়াল

সাংবাদিকদের তিনি এও বলেছেন, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ণে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাগুলোকেও যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে। তবে এর সাথে আরও একটা যুক্তিপূর্ণ দাবী কিন্তু তুলেছেন উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের একটা বিশাল অংশের ৬৫ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে অরণ্য। এর পরিবেশ এবং অরণ্যকে সংরক্ষণ করার জন্যে রাজ্য সরকারকে প্রভূত পরিমাণ ব্যয় করতে হয়। নিশাঙ্কের দাবী, কেন্দ্রের উচিত এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করা।

পাপ চাপা থাকবে না

(৫ পাতার পর)

মজা করে বলেছেন — ''গা টেপাতে যাইনি।" একথার অর্থ হল এখানে "ম্যাসাজ ক্লিনিক" আছে? সেখানে কারা আসতেন — কোন কোন মন্ত্রী নেতা আসতেন? এ-কথা প্রকাশিত হবে না। আবার রেজ্জাক বলেছেন — ''পাপ এবং পারা চাপা থাকবে না।" একথার অর্থ — ঘটনা প্রকাশ হবেই। আজ সিপিএম এবং তাঁদের মন্ত্রীরা আজ কোন পর্যায়ে যাচ্ছেন? — তার ফলে লোকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বৈদিক ভিলেজ-এর ঘটনাতে সিপিএম মন্ত্রীদের পদত্যাগ করা উচিত। অবশ্যই ক্ষমতার চিটে গুড়ে পা আটকে গেছে। ২০১১ সালে জনগণ এঁদের বিতাড়িত করবেই। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শুদ্ধি করণের দলিল তৈরি করছেন। সেই দলিল কার্যকর করবেন কে? এই মন্ত্রী নেতারা। চালুনির দল সূঁচের বিচার করবে। বৈদিক ভিলেজ প্রকল্পের সঙ্গে আবাসন দপ্তর জড়িত নয় এই কথা বলার জন্য আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। গৌতমবাবু বলতে পারেন, আপনার শাসিত দপ্তরে কোনও দুর্নীতি নেই? আপনি বোধহয় চোখ বুজে আছেন।

এইসব ভ্রষ্টাচারী মন্ত্রীদের পদত্যাগের দাবী অবিলম্বে তুলতে হবে।

এর বিশদ তদন্ত হওয়া দরকার। তদন্ত হওয়া দরকার "জাল কিট"-এর। একটা মজা বৈদিক ভিলেজ-এর অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, কিন্তু সিবিআই তদন্তের কথা বলেননি। কারণ কি আরাবুল? এ রাজ্যের মানুষকে সমস্ত তথ্য জানাতে হবে। যাতে আগামী দিনে জনগণ নিষ্কলুষ মানুষজনকে প্রতিনিধি করতে পারেন।

ভন্ডদের মুখোশ খুলে পড়ে মুখ ব্যাদান ও বিকৃত চেহারা ফুটে উঠেছে। জনগণ জাগবেনই। কৃতিমান সিপিএম মন্ত্রীদের আর একজন মহান কীর্তিমান নিরুপম সেন — যিনি নিজের জেলাতে নিন্দিত। একটি ছবিতে রতন টাটার সঙ্গে তাঁকে দেখা গেল। এই ছবিতে তিনি একেবারে হাসিতে ফেটে পড়ছেন।

তারপরই খবরে প্রকাশ পেলো — ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের। এ-রকম মাখামাখি পার্টির কর্মীরা ভাল চোখে দেখছেন না।

অন্ডালে নিরুপম একার সিদ্ধান্তেই জমি দখল করে একটি প্রকল্প করতে এগিয়েছেন। এর ভবিষ্যতও 'সিঙ্গুর' হবে। নির্লজ্জদের একঘরের ঘটনার শিক্ষা হল না। এঁরা একেবারে পুঁজিপতিদের দাস হয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের দিকে চলেছে। এ রাজ্যের মানুষ এদের ক্ষমা করবেন না। বিতাড়িত করবেনই। ২০১১ সাল — মনে কর শেষের সেদিন কিনা ভয়ঙ্কর।

শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গ গড়েছেন প্রণব মুখার্জী তাই মন্ত্রী হয়েছেন

শিবাজী গুপ্ত

রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন ঘাস ও মৃত্তিকায় ঢাকা পড়ে একটা ঢিপির সৃষ্টি হয়েছিল। সরল ও নিষ্পাপ হৃদয় কোনও রাখাল বালক তার উপর বসলেই সে রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো ন্যায় পরায়ণ ও সুবিবেচক হয়ে উঠত। কিন্তু কারও মনে কুটিলতা কৃত্রিমতা থাকলে তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগত না।

অতীত যুগের কথাটা নতুন করে প্রমাণিত হল দিল্লীতে অর্থমন্ত্রীর গদিতে আসীন কীর্ণাহারি বামুন প্রণব মুখার্জির ভারত ভাগ সম্পর্কে বাচাল উক্তিতে। পণ্ডিতেরা ঠিকই বলেছেন : মূর্খং করোতি বাচালম্ অর্থাৎ মূর্খদের বাচাল করেন। তা না হলে ভারত ভাগের জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দায়ী করেন?

প্রণব মুখার্জীর বিদ্যার দৌড় আমাদের জানা নেই, কিন্তু বুদ্ধির দৌড় দেশবাসীর জানতে বাকী নেই। তিনি যে চণ্ডীপাঠ কালে নিম্নলিখিত স্বরচিত স্তোত্রটি পাঠ করেন, তাও নাকি অনেকে শুনে থাকেন :—

ইতালী তনয়া দেবী রাজীব গান্ধী ঘরণীস্তথা

পদং দেহি গদিং দেহি শ্বেতপদধূলিং দেহি।

এবং সর্বক্ষণ জপ করে থাকেন, "যৎ কৃপা ত্বমহং বন্দে দশ নং জনপথনিবাসিনীম।" তা করুন, আপত্তি নেই; তিনি নেহরু গান্ধী গোষ্ঠীর পুরোহিতের ভূমিকায় থাকেন, তা কারো অজানা নয়। কে কার পূজা করবে, আখের গোছাবে তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে জটিল ইতিহাসে নাক গলাতে গেলেই নিশ্চিত অনর্থ বাধবে।

দেশভাগের জন্য দায়ী কে তা নির্ধারণ করতে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতকুল গলদ ঘর্ম হচ্ছেন। ৬০/৬২ বছরেও তার সঠিক জবাব মেলেনি। না মেলারই কথা। যে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভারত ভাগের মূল কারণ তার উৎস নিহিত রয়েছে কোরান শরিফে। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, আগা খাঁ, নবাব সালিমুল্লা, কবি ইকবাল, মহম্মদ আলি জিন্না কোরানের বাণীকেই হিন্দুদের কোরবানি করার কাজে লাগিয়েছে — বৃটিশ রাজপুরুষদের মন্ত্রণা ও প্রেরণায় বলীয়ান হয়ে। সে ইতিহাসের পাতা সংক্ষেপে হলেও উল্টে পাল্টে দেখা যেতে পারে।

সাম্প্রতিককালে পত্র-পত্রিকায় 'শ্যামাপ্রসাদ ও বঙ্গ-বিভাগ' বিষয় নিয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা চলছে। যারা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখেছেন, কিংবা পিতার হাত ধরে বা মাতার কোলে চড়ে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে / ভারতে চলে এসেছেন, তারা দেশবিভাগ-পূর্ব দিনগুলির বীভৎসতা ও ভয়াবহতা অনুভব করতে পারবেন না। তাদের বাপ-ঠাকুর্দা বা মা-ঠাকুমা বেঁচে থাকলে তাঁদের কাছ থেকে সে রক্তাক্ত ইতিহাস তারা জেনে নিতে পারে। এই পরবর্তী প্রজন্মের কেউ কেউ মনে করে বাংলা ভাগের জন্য, দেশ ভাগের জন্য হিন্দুরাই দায়ী এবং বাংলা ভাগ না হলে তারা কি সুখেই না বসবাস করতে পারত! এদের অবগতির জন্য বলা ভালো যে, ভারত ভাগ আর বাংলা ভাগ একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। একটি বাদ দিয়ে অপরটির আলোচনা হয় না। ভারত ভাগ হবে অথচ বাংলা ভাগ হবে না, তা তো হতে পারে না! এই বাংলা ভাগ প্রসঙ্গেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভূমিকার কথা এসে পড়ে।

ইংরেজের মদতে সৃষ্ট মুসলিম লীগ ছিল মুসলমানদের মুখ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তারা কংগ্রেসের সাথে মিলেমিশে ইংরেজের হাত থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণে রাজী নয়। তারা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি নিয়ে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করতে বদ্ধ পরিকর। বছরের পর বছর আলোচনা, দরবার বৈঠক সব নিষ্ফল। মুসলিম লীগের মুরুব্বি ইংরেজ শাসকচক্রের প্ররোচনায় তারা ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে পাকিস্তান দাবীতে অনড়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে পাকিস্তান তাদের চাই-ই। কংগ্রেস সরাসরি পাকিস্তান দাবী মেনে নিচ্ছেনা বলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিল ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬, কলকাতায়; সে নির্বিচার হত্যা লুণ্ঠন নারী নির্যাতন ও ধ্বংসলীলার কাহিনী থাক।

কিছুদিন পর ১০ অক্টোবর ১৯৪৬, নোয়াখালি জেলায় সংখ্যাল্প হিন্দুদের (১৮ শতাংশ) উপর একই পৈশাচিকতা ও বর্বরতার পুনরনুষ্ঠান। সেই সঙ্গে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ। তাছাড়া পূর্ব বাংলার অন্যান্য জেলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরও কোথাও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোথাও বা বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ চলতে থাকে। স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষে ঐ তারিখ দুটিরও স্বর্ণজয়ন্তী পালিত হওয়া উচিত ছিল বই কি। কারণ, উপমহাদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ঐ কালো দিন দুটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

আধুনিক পাঠকের কৌতূহল মিটাতে কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গা থেকে দুটি করে ঘটনা উদ্ধৃত করা হল।

কলকাতা — (১) ইউনিভার্সিটি খোলা ছিল। রাজাবাজারের ওপর দিয়ে আমাকে যেতো হতো। একদিন দেখলাম, গরু কেটে যেমন ঝুলিয়ে রাখে, তেমনিভাবে হাত-পা কাটা হিন্দু মেয়েদের চুল বেঁধে সব ঝুলিয়ে রেখেছে। বীভৎস আর নৃশংস সে দৃশ্য, সেই প্রথম আমি মেয়েদের খোলা উর্দ্ধাঙ্গ দেখলাম।

(গোলোকবিহারী মজুমদার, প্রাক্তন আই জি অফ পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ)

(২) নিস্তারিণী ছাত্রাবাসে ১৮ জন ছাত্রকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

(৩) ২৫ নং বুধু ওস্তাগর লেনের বাড়িতে ৩৭ জনের মধ্যে ২৫ জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়।

নোয়াখালি — (১) রামগঞ্জ থানার গোপাইরবাগ দাসদের বাড়িতে ১৯ জন পুরুষকে হত্যা করা হয়। ১৯ জন কুল বধূ বিধবা হয়। পুরুষদের যখন জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল তার পাশেই চলছিল সদ্য বিধবা মহিলাদের উপর গণধর্ষণ।

(২) কলকাতার চৌধুরী বাড়িতে জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর পরিবারের রাজেন্দ্রবাবু সহ ২২ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বাড়ির নারীরাও লাঞ্ছিতা হয়।

কলকাতা ও নোয়াখালির পর এবার পাঞ্জাবের পালা। যেহেতু বাঙালী হিন্দুরা ভাবের ঘরে চুরি করতে ওস্তাদ, কিল খেয়ে কিল হজম করতে পারদর্শী, তাই তাদের উপর মুসলিম প্রতিবেশীদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনী চেপে গিয়ে তারা যে দয়ালু উপকারী ও সহানুভূতিশীল সেকথা সাতকাহন করে প্রচার করে। পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) মুসলমানরা যদি এতই মহামানব হয়, তাহলে কেন সে সোনার বাংলা ছেড়ে পোড়া পশ্চিমবঙ্গে এলো, সে কথার জবাব নেই।

কিন্তু পাঞ্জাবীরা বীরের জাত, তারা মরতেও জানে মারতেও জানে। তাদের উপর যে অবর্ণনীয় পৈশাচিক অত্যাচার হয়েছে তার কিঞ্চিৎ নমুনা থেকেই সে বীভৎসতার পরিচয় মিলবে :—

"যাহারা খুন হইয়াছে তাহাদের যেসব শিশু ছেলে ছিল, তাহাদের পা দুটি ধরিয়া দেওয়ালের গায়ে আছড়ে মারা হইয়াছে। আর মেয়ে সন্তানদের ওইভাবে মারিবার আগে ধর্ষণ করিয়া নেওয়া হইত। আর তাহারা যদি কিশোরী বা তরুণী হইত, তাহলে তাহাদের ধর্ষণ করিবার পর তাহাদের স্তন কাটিয়া ফেলা হইত। এদের মধ্যে কেউ সন্তান সম্ভবা থাকলে ধর্ষণের পর তাদের উদর চিরিয়া ফেলা হইত।"

জিন্নার চেলাচামুণ্ডাদের এরকম পৈশাচিক আচরণে জিন্নার মনে কোনও বিকার ঘটেনি। বরং তিনি বলেছেন, পাকিস্তান দাবী না মানলে এ ধরনের ঘটনা চলতেই থাকবে। আর তার প্রধান চেলা লিয়াকত আলি খাঁ বলেছেন "পাঞ্জাবে যা ঘটেছে, পাকিস্তান না মানলে সারা ভারতে তা ঘটবে।"

তখন দলমত নির্বিশেষে পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দ — মাস্টার তারা সিং, বাবা হরকিষণ সিং, বাঘ সিং, যোগিন্দর সিং মান, গুরুবচন সিং, ইন্দার সিং, জাঠেদার মোহন সিং, বলদেব সিং, হুকুম সিং, উজ্জ্বল সিং, গিয়ানী কর্তার সিং প্রমুখ একবাক্যে পাঞ্জাব ভাগের দাবী তোলেন। এবং সে দাবী প্রত্যাখ্যান করা গান্ধী-নেহরু কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস পাঞ্জাব ভাগের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হল। অন্যে পরে কা কথা। স্বয়ং পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ই জেন কিংস, মুসলিম লীগ নেতাদের-এ ধরনের নির্লিপ্ত মনোভাব বিষয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন : এই পৈশাচিক বর্বরতা মুসলিম লীগের পরিকল্পিত;পাঞ্জাবের হিন্দু শিখরা মুসলমানদের জন্তু-জানোয়ারেরও অধম মনে করে; মুসলিম লীগকে ক্ষমতাসীন করার আগে আমি পদত্যাগ করব; কোনও বৃটিশ অফিসার এ ধরনের মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করবে কিনা সন্দেহ।

এদিকে জিন্নাও বিষের বাঁশী বাজিয়েই চলেছেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন — পাকিস্তান বিরোধীরা ইসলামের শত্রু। জিন্নার চোখে হিন্দুরা মনুষ্যেতর জীব; একসঙ্গে বসবাসের অযোগ্য। বিলাতে লর্ড ইজমের সঙ্গে আলোচনায় জিন্নার এরূপ বিকৃত মনোভাবের পরিচয় পেয়ে ইজমে লিখেছেন : মিঃ জিন্নার মন জুড়ে রয়েছে হিন্দুদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও হীনদৃষ্টি। হিন্দুদের তিনি মনুষ্যেতর জীব মনে করেন এবং তাদের সঙ্গে মুসলমানদের বসবাস অসম্ভব বলে বিশ্বাস করেন :— "The dominating feature in Mr. Jinnah's mental structure was his loathing and contemt of the Hindus. He apparently thought that all Hindus were sub-human creatures with whom it was impossible for the Muslims to live."

পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখ নেতৃবৃন্দ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন হত্যাকারী মুসলিম লীগের সঙ্গে সরকার গঠনে তারা নেই। সর্দার বলদেব সিং মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি লিখে জানালেন : অবিলম্বে পাঞ্জাব ভাগ চাই।

কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার পরেও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারত ভাগ বা বাংলা ভাগের দাবী করেননি। কিন্তু পাঞ্জাব ভাগের দাবী উঠতেই ভারত ভাগের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। তখন শ্যামাপ্রসাদ পাঞ্জাবের মতো বাংলা ভাগের দাবী তুললেন। তিনি দেখলেন নৃশংসতা ও বর্বরতায় বাঙালী মুসলমানে ও পাঞ্জাবী মুসলমানে কোনও ভেদ নেই। এদের পশু বললেও পশুর অপমান করা হয়। এরা পশ্বাধম। এদের পক্ষ নিয়ে যারা সাফাই গায়, তারা সৎমায়ের সন্তান নয়, মাতৃগর্ভের লজ্জা।

এদের কবল থেকে বাংলার এক তৃতীয়াংশ রক্ষা করেছেন শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর রক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত হয়েই প্রণব মুখার্জী আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পাকিস্তানের দাবী মতো পুরো বাংলা পাকিস্তানে গেলে প্রণব মুখার্জীকে হয় দণ্ডকারণ্য, নয় তো আন্দামানে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে হতো। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো লোকেরা মুসলিম ভোটের জন্য দারুণভাবে জিন্না-দরদী সেজেছেন। কিন্তু জিন্নার জল্লাদ চেলাদের হাতে যেভাবে বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখ মেয়েরা নিগৃহীত হয়েছে, তেমনভাবে প্রণববাবুদের মেয়ে-নাতনিদের ধর্ষিত ও কর্তিত স্তন, দেহ তাদের সামনে এনে যদি ফেলে দিত, তখনও কি তিনি আনন্দে বগল বাজাতেন ও সানন্দে "ঈশ্বর-আল্লা তেরে নাম" বলে রামধুন গাইতেন?

প্রণবদার বঙ্গবিভাগ

তরুণ বিজয়

"জিন্না ভারতের অন্তরাত্মাকে ভাঙতে চান"

— ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ ভারত ভাগ সমর্থন করেছেন। এর থেকে সত্যের অপলাপ আর কী হতে পারে! এটা হলো নেহেরুজীর পন্থা — দেশপ্রেমিকদের দোষারোপ করা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা। এবং তা আরেকবার প্রতিপন্ন করা হল। নীচে বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরা হল।

প্রথমতঃ মুসলিমরা ভয় দেখিয়ে, নিজেদের ক্ষমতা জাহির করে, নিজেরা কোনওরকম শিষ্টাচারের পরোয়া না করে পিস্তল দেখিয়ে কাজ করে। এরা আল্লার নাম করে সাধারণের মধ্যে ধর্মের সুড়সুড়ি দেয়। এই ধর্মের জিগির তুলেই এরা যেভাবে নরহত্যা চালায় তা তুলনারহিত। তাই কংগ্রেসী টিকিটে বাংলার বিধায়ক হয়েও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী লিখেছিলেন, "কলকাতায় যা ঘটেছে আধুনিক ইতিহাসে তার কোনও নজির নেই। সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসে ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে যে ভয়াবহ নারকীয় ঘটনা ঘটেছে তাকেও ম্লান করে দিয়েছে কলকাতার ঘটনা। একদিন বৃটিশ ভারতের প্রথম মহানগর হিসেবে গণ্য হত যে কলকাতা তারই গলিতে গলিতে সেই বর্বরতা, হত্যালীলা চলেছে"।

এই ঘটনা হল জিন্নার প্ররোচনায় সংগঠিত মুসলিম লীগের ডাকা হিংসার খোলাখুলি ব্যবহার। যা সেই সময়ে ভারতের একতা, সংহতি, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছিল। মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ১৯ জুলাই সরাসরি আক্রমণের (ডায়রেক্ট অ্যাকশন) যে ডাক দিয়েছিল তার প্রবক্তা হলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "এই দিনে আমরা সাংবিধানিক রীতি-নীতিকে না মেনে সরাসরি লড়াইয়ের শপথ নিচ্ছি। আমি কোনও শিষ্টাচার দেখাতে, সৌজন্যতা দেখাতে প্রস্তুত নই। আমাদের হাতে বন্দুক রয়েছে এবং আমরা তা যথেচ্ছ প্রয়োগ করব"।

এই কলকাতায় প্রত্যক্ষ আক্রমণের পর অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের সময়ে এক বিতর্কে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, "গত ৩১ জুলাই মুম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যখন জিন্নাকে 'প্রত্যক্ষ আক্রমণের' বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই প্রত্যক্ষ আক্রমণ কি হিংসাশ্রয়ী না কি অহিংস আন্দোলন? উত্তরে জিন্না বলেছিলেন, "আমরা কোনও শিষ্টাচার মানি না"। কিন্তু খাজা নজিমউদ্দিন কোনও রাখঢাক না করেই বলে দেন যে, "মুসলমানরা অহিংসায় আদৌ বিশ্বাসী নয়।" এই সমস্ত বক্তব্য এসেছিল দায়িত্বশীল মুসলিম নেতাদের কাছ থেকে। এই বক্তব্যের অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন মর্নিং নিউজ, দ্য স্টার অব ইন্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন লেখকের প্রতিবেদনে বেরিয়ে এসেছে প্রত্যক্ষ উস্কানিমূলক লেখা। হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ, হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে এইসব লেখায়। আর সাধারণ মুসলিম জনতা এই নির্দেশ মেনে দাঙ্গা চালিয়েছে হিন্দুদের উপর। সুতরাং এটা খুব জরুরী যে, পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা ভ্রান্ত এবং আপনাদের মাথা থেকে এই ধ্যান ধারণা মুছে ফেলা উচিত। আসুন আমরা বাংলায় একসাথে বসবাস করি"।

মিঃ প্রণব মুখোপাধ্যায়, এটা হল ১৯৪৬ সালের ঘটনা এবং উপরের বক্তব্য হল শ্যামাপ্রসাদবাবুর। প্রণবদার বক্তব্যের অর্থ ---প্রকৃত এবং একজন স্বদেশপ্রেমিককে হেনস্থা করার অপচেষ্টা মাত্র যিনি সবসময় দেশের ঐক্যের জন্য লড়েছেন।

এটা আশ্চর্যজনক যে, কীভাবে প্রণববাবুর মতো একজন নেতা ভারতের সংহতির একজন এহেন প্রবক্তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু এমন এক লড়াকু নেতা যিনি সংহতি, ঐক্যের স্বার্থে লড়তে গিয়ে এক অজ্ঞাত কারণে শ্রীনগর জেলে প্রাণ বলিদান দেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবু ছিলেন ঋষি অরবিন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং তিনি এক সংঘবদ্ধ ভারতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। তিনি বলতেন, "আমাদের সামনে বহু বিপদ এবং দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের উৎপত্তির আন্দোলন নতুন সমস্যারূপে উপস্থিত হয়েছে এবং বিষয়টাকে লঘু করে দেখলে ঠিক হবে না। এই দাবিকে এখনই সমূলে উৎপাটন করে ফেলতে হবে সমস্ত হিন্দুস্থানপ্রেমী দেশবাসীকে"। (সিলেট, ৭.৪.১৯৪০)।

সুতরাং তাঁর স্বপ্ন ছিল সংঘবদ্ধ ভারতের এবং কখনই বিচ্ছিন্ন, খন্ডিত ভারতের নয়। তিনি সকলের সাহায্য চেয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি লিখলেন, "এই প্রদেশে সাংবিধানিক ক্ষমতা মুসলমান মন্ত্রীদের কুক্ষিগত, চারদিক থেকে প্রত্যহ হিন্দুদের দমন পীড়নের খবর আসছে। আমার নিজের কাছে এমন প্রমাণ রয়েছে যে, বর্তমান রাজ্য সরকার পরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে খতম করতে চাইছে।"

হিন্দুদের বিপন্ন দশায় কংগ্রেস একেবারে নীরব দর্শক। ডঃ মুখার্জী লিখলেন, আমরা যদিও জানি সত্য এর বিপরীত। মুসলিম তোষণ করেও কংগ্রেস নিজেদের দলে অধিক সংখ্যায় মুসলিমদের টানতে পারেনি। এবং তথাপি কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দুস্বার্থের বিষয়ে একেবারেই উদাসীন"।

এই মতের পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন, "হিন্দু হিসেবে আমাদের নীতি খুব স্পষ্ট। আমরা চাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি। আমরা বিশ্বাস করি এই দেশ অতীতে যেভাবে চলেছে ভবিষ্যতেও সেভাবে চলবে। এই দেশ হিন্দুদের মতোই অন্যদের আবাসস্থল। তাদের কাছে আমাদের নিবেদন যে, তারা এদেশকে নিজেদের পিতৃভূমি বলে মনে করুক এবং এই দেশের সুখে-দুঃখে নিজেদের সামিল করুক"।

জীবনের শেষ মুহুর্ত অবধি তিনি তা বিশ্বাস করতেন — "আমরা উন্নত হব, আমরা একতাবদ্ধ হব। আমরা এমন দেশে বাস করি যার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে আমাদেরই সন্তানদের হাতে। তাদের হাতে উড়বে স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ দেশের ধবজা, এই ধবজা বহন করবে আগামীদিনের শান্তি, উন্নয়ণ, সহমর্মিতা ও স্বাধীনতার বাণী"। ছত্ত্বপ্সক্তজব্ধড়ঢ়স্তুন্ত্র ত্নক্তজপ্লন্দন্তুন্ত্রপ্ত ড্রন্দস্তুত্ত্ব ট্রপ্সন্দ্রন্দ্বক্তজন্ধন্তুন্দ্ব, ১৪.৪.১৯৪০গ্ন। তিনি

> "ডঃ মুখার্জী কখনও-ই ভারত বিভাগ মেনে নেননি। বরং মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে কংগ্রেসী আত্ম-সমর্পণ যেমন কোটি কোটি ভারতবাসী মানতে পারেনি, তেমনি শ্যামাপ্রসাদবাবুও অসহায়ভাবে মেনেছেন।"

জানতেন পাকিস্তান তৈরীর পরিকল্পনা বৃটিশ মস্তিষ্কপ্রসূত এবং বলতেন, "বৃটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তরে গররাজি ছিল এইজন্য যে, দেশের ৭০ শতাংশ হিন্দু মুসলমানদের ওপর প্রভূত্ব করবে এমন পরিস্থিতি মুসলিম নেতৃত্ব মানতে পারবে না। বৃটিশ সরকার জাতীয় স্তরে নির্বাচকমন্ডলী গঠন করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয়স্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা করেছে। বৃটিশরা এক বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখার জন্য বদ্ধ পরিকর। কারণ এরা জানে যে, যদি যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা যায় তাহলে জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকবে এবং এর ফলে ভারতের ওপর বৃটিশ প্রভুত্বের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয়ে যাবে।"

তিনি কখনওই গান্ধীজীর মুসলমান তোষণ নীতি মেনে নেননি। ১৯৪৪ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বললেন, "গান্ধী জিন্নাকে ছাড় দিয়ে মস্ত ভুল করেছেন। গান্ধী ও কংগ্রেসকে বারবার সতর্ক করে তিনি বলেছেন যে, জিন্না তোষণ একেবারেই ঠিক পন্থা নয়। আসলে জিন্নার বিভাজন নীতি রুখতে তিনি ফজলুল হককে ১৯৩৯ সালে সমর্থন করে বসলেন। তিনি সি রাজা গোপালাচারিকে সতর্ক করলেন। বললেন, "জিন্না তাঁর নীতি ক্রমাগত বদলাচ্ছেন এবং যদিও বা ভারতভাগ মেনে নেওয়াও হয়, তবে জিন্না জেলান্তরে গণ ভোট দাবি করবেন (ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ, এস সি দাস)।

লুধিয়ানায় তিনি ঘোষণা করলেন, "ভারতকে টুকরো করতে কোনও ধর্মীয় দাবির সঙ্গে আপোষ করা যাবে না। কোনওভাবেই না — যদি তা করা হয় তাহলে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকেবা প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিতে হবে। ভারত এক অবিভাজ্য, অখণ্ড দেশ ছিল, আছে ও থাকবে। এই ভাবনা কিছু মুসলিমদের মধ্যে এসেছে যে হিন্দুদের কাছে নতজানু হয়ে বাস করা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমন ভাবনা ভয়ানক, সুতরাং এরা চাইছে দেশকে খণ্ড করে পৃথক এক সার্বভৌম, স্বাধীন রাষ্ট্র। এমন এক রাষ্ট্র যেখানে হিন্দুরা তাদের জাতীয়তা খুইয়ে বাস করবে। এমন প্রস্তাব ভারতীয় স্বাতন্ত্র্যের পিঠে সরাসরি ছুরি বসানো। ....আমি আশা করি যে, এই সংগ্রামের সময় যা আমাদের সামনে রয়েছে তাতে হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান, বৌদ্ধ সবাই একত্রে এই সংগ্রামে সামিল হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যারা আমাদের এই ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায় তাদের সেই প্রয়াসকে প্রতিহত করা যাবে।

সবশেষে জিন্নার কাছে কংগ্রেসের আত্মসমর্পণ জাতীয়তাবাদীদের কাছে আর কোনও পথ খোলা রাখল না এবং ১৯৪৬ সালে মুখার্জীকে দেশভাগ মানতে হয়েছিল এইজন্য যে, এছাড়া উপায়ন্তর কিছু ছিল না। এবং বাধ্য হয়ে পূর্ববঙ্গ বিচ্ছেদ মানতে হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, যেখানে ২৫ শতাংশ মুসলিম ভারতে থাকতে পারবে না সেখানে কীভাবে ৪৪ শতাংশ হিন্দু ৫৪ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বাঙলায় থাকবে? তাঁর বাধায় ব্যর্থ হয়েছিল শরৎ বোস (নেতাজী সুভাষের ভ্রাতা), হুসেন সুরাবর্দীর মতো মুসলিম নেতার চেষ্টা যারা ১৯৪৭ সালে এক স্বাধীন বাংলা গড়ার প্রস্তাব কার্যকর করতে চেয়েছিলেন।

নির্বিচারে হিন্দু হত্যায় সকলেই শোকতপ্ত, হিন্দু নেতাদের সামনে ভারত বিভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, "আমরা সকলেই নিরাশ। হিন্দু হিসেবে আমরা আত্মত্যাগে তৈরি, আমরা আমাদের অধিকার ছেড়ে দিতে চাইছি এক সঙ্ঘবদ্ধ ভারতের জন্য যেখানে হিন্দু-মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হয়। আমাদের শান্তির আহ্বান তাদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে প্রায়ই ভুল বোঝার অবকাশ থাকে যা আমাদের দুর্বল করে দেন। কেবল হিন্দু মুসলমান বিভাজিত নয়, হিন্দুদের মধ্যে যে মেকি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাও ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্নকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে।

ডঃ মুখার্জী কখনও-ই ভারত বিভাগ মেনে নেননি। বরং মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে কংগ্রেসী আত্ম-সমর্পণ যেমন কোটি কোটি ভারতবাসী মানতে পারেনি, তেমনি শ্যামাপ্রসাদবাবুও অসহায়ভাবে মেনেছেন।

লেখক দিল্লীর শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর। (সৌজন্যে : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ভাষান্তর : তারক সাহা)

জিন্না, ভারত বিভাগ, স্বাধীনতা

ভারতীয় জনতা পার্টির একজন বর্ষীয়ান নেতা যশবন্ত সিং সম্প্রতি প্রকাশিত, তাঁর 'Jinnah : India Partition, Independence' শীর্ষক পুস্তকে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, দুটি অসত্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাতে একদিকে জিন্না-স্তুতি করা, অপরদিকে গান্ধীজীকে দেশভাগের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেবার একটা প্রকট অপচেষ্টা করা হয়েছে। তিনি তাঁর পুস্তকের এক জায়গায় লিখছেন,

(ক) "স্বাধীনতা উত্তর ভারতের নীতি নির্ধারক সংস্থায় মর্যাদার আসন পেলে ভারতীয় মুসলমানরা পৃথক জাতীয়তার দাবী ছেড়ে দেবে, একথা তিনি (জিন্না) বলেছেন ...."

সিংজী তো বলেই খালাস। কিন্তু কোথায় কবে এবং কোন ভাষণে একথা বলেছেন এবং কাকেই বা বলেছেন, সে বিষয়ে তিনি কোনও আলোকপাতই করেননি। ইদানীং জিন্নাস্তুতির একটা ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে, যার সূত্রপাত করেছিলেন বিজেপির প্রথম সারির নেতা — লালকৃষ্ণ আদবানী, পাকিস্তান সফর থেকে ফিরে আসার পর। কিন্তু কেন?

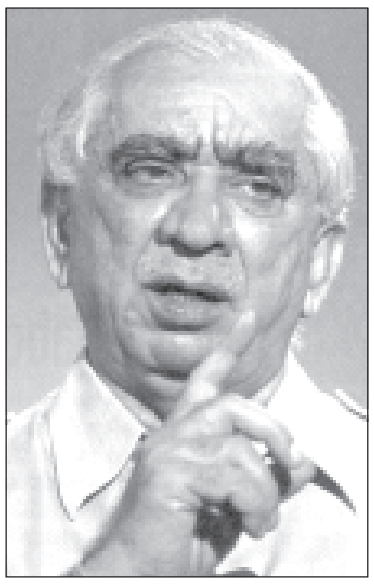

ভারতবাসী তথা পৃথিবীর লোক বিলক্ষণ জানেন, মুসলিমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নন — তারা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। এমনকী জিন্না সাহেবের মুখ দিয়ে একথাও বেরিয়েছে, 'হয় পাকিস্তান মেনে নাও, নতুবা গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক'। সুতরাং যশবন্তজী কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পূর্বোক্ত বক্তব্যের অবতারণা করেছেন তার বিচারের ভার দেশবাসীর উপরই আপাতত ছেড়ে দেওয়া গেলো। শুধু বিজেপিই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় বলে মনে করি।

(খ) দ্বিতীয় বক্তব্য : "জিন্না তত কিছু পাকিস্তান অর্জন করেননি, যত না নেহেরু, প্যাটেল জিন্নাকে পাকিস্তান ভেট দিয়েছেন'। শুনতে মন্দ শোনায় না। কিন্তু কোন যুক্তিকে বা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গান্ধী মহারাজকে দেশভাগের দায়-দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিলেন? চুনো-পুঁটিদের সবাই গালাগাল দিতে পারে, কিন্তু রাঘব-বোয়ালদের পিছনে লাগাতে বেশ শক্তিশালী মানসিকতার প্রয়োজন হয়। সেই মানসিকতা প্রকাশ করার ক্ষমতা যদি না থাকে তবে অনৈতিহাসিক ঘটনার অবতারণার পেছনে যে খুব একটা সুস্থ ও সৎ উদ্দেশ্য আছে, তা মনে করার কোনও কারণ নেই। আমি কখনই বলবো না দেশভাগের জন্যে নেহেরু-প্যাটেল মোটেই দায়ী ছিলেন না — গান্ধীজীর মতো তাঁরা উভয়েই সমভাবে দায়ী। এই দায়-দায়িত্বের উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সুচিন্তিত অভিমত আছে। নেহেরু-প্যাটেল জুটির উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা। আর গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর সারাজীবনের মুসলিম প্রীতির বাস্তব রূপায়ণ।

সুতরাং গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে দেশভাগের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নেহেরু-প্যাটেলের ঘাড়ে চাপানোর পেছনে কোনও যুক্তি বা সত্যতা তো নেই-ই বরং এই বক্তব্য পেশের পেছনে কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে — যাকে কোনওক্রমেই মহৎ বলা যায় না — সে ব্যাপারে বর্তমান লেখকই শুধু নয়, অনেকেই নিঃসন্দেহ নন।

এ প্রসঙ্গে আমার বর্তমান পুস্তকে 'দেশভাগের জন্যে গান্ধীজীই দায়ী' শিরোনামে যে অধ্যায় যুক্ত করেছি তাতেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। নতুন করে কিছু বলার নেই। তবুও, পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট হবার ঝুঁকি নিয়েও বলতে হচ্ছে — দেশভাগের জন্যে নেহেরু প্যাটেলরা খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন, সন্দেহ নেই। কারণ দেশভাগ না হলে তাঁদের কেউই ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন না, অথচ ক্ষমতার লোভ তাঁদের ষোল আনার জায়গায় সতেরো আনা ছিল। একথা অনস্বীকার্য, সেদিন যদি গান্ধীজী দেশভাগে মদত না দিতেন তবে কিছুতেই দেশভাগ হোত না। তখন দেশের অবস্থা যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তাতে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাও একেবারে অসম্ভব ছিল না। দেশভাগের চেয়ে গৃহযুদ্ধে ক্ষতি উভয়পক্ষেরই হতো। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনও দেশ আছে কি, যেখানে এরূপ পরিস্থিতিতে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়নি? দেশভাগে বিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ও দু'কোটি লোকের ঘর ছাড়ার চেয়ে গৃহযুদ্ধ অনেক ভাল ছিল। সেক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ শেষে অবশিষ্ট মানুষগুলো নিজ নিজ বাড়ীতেই থাকতে পারতো এবং উদ্বাস্তু হয়ে শেয়াল - কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতে হোত না এবং ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করতে হোত না। শেষ পর্যন্ত যারা এতটুকুও জোগাড় করতে পারেননি তাদের সবাই এক এক করে অনাহারে অচিকিৎসার শিকার হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ভারতের বুকে যে তাণ্ডব, যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন শুরু হয়েছিল, ১৯৪৭-এর পূর্বে এবং পরে, তার ধারাবাহিকতা দীর্ঘ ৬২ বছর পরও চলছে অব্যাহতগতিতে। এর জবাবে যশবন্ত সিংজীর কি উত্তর বা জবাব আছে, তা তিনি বলবেন কি? না, সেকথা বলার হিম্মৎ তিনি রাখেন না। কারণ তাঁর পুস্তকের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ তিনি দিয়েছেন।

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু, এল আই সি টাউনশিপ, কলকাতা - ১২৯

স্কুল হস্টেলে ছাত্রদের গোমাংস

গত ৩১ শ্রাবণের (১৭.৮.০৯) স্বস্তিকায় পড়লাম সিউড়ি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হস্টেলে ছাগল বা মুরগীর মাংস দেওয়ার বদলে গো-মাংস খেতে দেওয়ার মতো ঘটনার কথা।

সিউড়ি মফঃস্বল শহর। সেখানে এই একবিংশ শতকের সমাজে এই ঘটনার ফল কতদূর প্রসারিত হবে জানি না। কিন্তু এটি যে স্কুল কর্তৃপক্ষের একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ সে বিষয়ে সন্দেহ করলে ভুল হবে।

হিন্দুর সংখ্যা ভারতে ক্রমশ শতকরা হিসেবে কমে যাচ্ছে। শত শত হিন্দু মেয়ে প্রলোভনে পড়ে অন্য ধর্মীয়দের বিবাহ করে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বহুভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ ঘটছে। এই ঘটনা যাতে সেদিকে না মোড় নেয় সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

সিউড়ির ঘটনার শতবর্ষ আগে ঘটা পাটনার কাছে গঙ্গানদীর চরে দিয়ারার এক গ্রামের ঘটনা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। সেখানে গ্রামের কুয়োর জলে পচা গন্ধ বার হওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে গরুর গোটা পা জলে পচে আছে পাওয়া যায়। সেই জলপান করার দোষে সমস্ত গ্রাম জাতিচ্যুত হয়েছিল। আমরা সে কাহিনী বড়দের মুখে শুনেছি। আজও সেই জাতিচ্যুত গ্রাম রয়েছে যেখানে লোকে আজও স্বধর্ম থেকে নির্বাসিত হয়ে জীবন যাপন করছে। গঙ্গার চরে বাস করেও গঙ্গা-মাহাত্ম্য না জানার মূল্য তারা আজও দিয়ে চলেছে।

সিউড়ির এই ঘটনায় গোমাংস আহার করায় কারও দোষ হয়নি একথা স্পষ্ট করে ধর্মাচার্যদের বলা উচিৎ। আমাদের বহু সম্পদের মধ্যে পতিতপাবনী সর্বপাপ বিনাশিনী গঙ্গা রয়েছেন। গঙ্গোদক পান করে আজও বহু হিন্দু নরনারী গোমাংস আহারের দোষ স্খালন করছেন নিশ্চিন্তে এবং স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকছেন। এ জিনিস আমার নিজের দেখা। বাংলাদেশে নানা সময়ে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা এসে সেখানে বহু লোককে নানা কারণে জোর করে গোমাংস খেতে বাধ্য করে। সেখানকার অসহায় হিন্দুরা প্রতিবাদ না করে সেই মাংস মুখে তুলে নেন ও পরে গঙ্গোদক পান করে বাহ্য ও অন্তরে শুচি হয়ে যান। এমন সহজ সমাধান বার করে যেভাবে তাঁরা নিজেদের ধর্মরক্ষা করে চলেছেন তা সকলেরই শেখার মতো। এই বিচক্ষণতার বহুল প্রসার ঘটুক। এই প্রার্থনা জানাই।

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, কসবা, কলকাতা।

ডুডুও খাব, তামাকও খাব

২৫ আগস্ট, ২০০৯ এ অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করেছে যে, কেন্দ্রকে অনুরোধ জানানো হবে যে দলিত খৃস্টানদেরও "সিডিউল্ড' কাস্ট মর্যাদা দেওয়া হউক যাতে দলিত খৃস্টানরাও সিডিউল্ড কাস্টদের ন্যায় সবকিছু সুযোগ নেওয়ার সমান অধিকার পায়" (মনে রাখতে হবে, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজশেখর রেড্ডি একজন খৃস্টান। সম্প্রতি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন)।

ইংরেজ শাসন আমলে খৃস্টান ধর্মান্তরিতরা সংরক্ষণের কথা ভাবেনি। কারণ তারা রাজার ধর্মের লোক। সমস্ত বিষয়ে তাদের উন্নতির পথ ছিল অবারিত। বর্তমান ভারতেও সংবিধানের রং গায়ে চড়িয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সুযোগ নিয়ে এবং সংখ্যালঘু কান্না কেঁদে অলিখিত সুযোগ নিয়েও তারা খুশী নয়। ভারতের সিডিউল্ড কাস্টদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া আছে তাতেও খৃস্টানরা পুনঃপুনঃ খাবলা মেরে যাচ্ছে। খৃস্টান হলে সে আর দলিত থাকে না — পুণ্যাত্মা হয়, এই ছিল পাদ্রীদের এতকালের দাবী। কিন্তু হিন্দুদের স্বার্থে থাবা দেওয়ার জন্য সব ভুলে তাদের এই বর্তমান উদ্যোগ।

হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত খৃস্টান হয়েও যদি খৃস্টানদের মধ্যেই সমান মর্যাদা না পাওয়া গেল তবে আর মুক্তি হলো কোথায়? আমরা এই ছল - চাতুরীর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। নব খৃস্টানদের আহ্বান জানাচ্ছি, বৃথা আন্দোলনের ধোঁকা না খেয়ে পিতৃ-পিতামহের ধর্মে ফিরে এসে সোজা উন্নতির পথে নেমে আসুন।

ডাঃ অরুণ কুমার গিরি, বেহালা।

প্রতিভা বিকাশ

স্বস্তিকার ৬২ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় 'এইসময়' কলমে পড়লাম, "প্রতিভা বিকাশ" গর্ভাবস্থায় মাতৃজঠরে শিশুর প্রতিভার বিকাশ হয়। 'ইনস্টিটিউট ফর চাইল্ড হেলথ রিসার্চ' সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য জানতে পারে।

আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমরা জানি আমাদের মায়েরা যখন অন্তঃসত্ত্বা থাকেন, সেই সময় তাঁদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মাচারণ ও সুন্দর দৃশ্যাবলী দর্শন, মঠ ও মন্দিরে যাওয়া, সৎসঙ্গ, সৎ আলোচনা করার জন্য বলা হয়। ফলে গর্ভের সন্তান ধার্মিক, দেশপ্রেমিক, সাহসী, বলবান ও সৎ চরিত্র প্রাপ্ত হয়।

মহাভারতের যুগে আমরা জানতে পারি যে, সুভদ্রাকে অর্জুন যখন চক্রব্যূহে কীভাবে প্রবেশ ও বাহির হবার কথা শোনাচ্ছিল সেই সময় সুভদ্রা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। চক্রব্যূহে প্রবেশের কথা শোনার সময় সুভদ্রা জেগে ছিলেন। কিন্তু বের হবার কথার সময় সুভদ্রা নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। ফলে অভিমন্যু চক্রব্যূহ হতে বের হবার কৌশলটা রপ্ত করতে পারে নাই।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে মাতৃভূমি ভারতবর্ষে, এই পদ্ধতি হাজার হাজার বৎসর আগে প্রচলিত ছিল।

সুনীল কুমার বিষ্ণু, সিউড়ি, বীরভূম।

চিঠিপত্র

চীনের ছক

গত ২৪ আগস্ট '০৯ স্বস্তিকা-র দুইয়ের পৃষ্ঠায় দেখলাম যে, চীনের "ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ' বলে সরকারী সংস্থা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যে, ভারতবর্ষকে ত্রিশ থেকে চল্লিশ টুকরোতে ভাগ করা হবে। এই কাজে তাদের সহযোগী হিসাবে দেখছে মুসলিম এবং খৃস্টান সম্প্রদায়কে। এর সাথে আমাদের দেশের রাষ্ট্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টরা তো আছেই।

খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমকে, পাকিস্তানের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরকে এবং শ্রীলঙ্কার মাধ্যমে তামিলনাড়ুকে, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। আর চীন নিজে আক্রমণ করে অরুণাচল প্রদেশ ও লাদাককে দখল করতে চায়। ভারতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী জনগোষ্ঠীদের মদত দিয়ে ভারতবর্ষকে ভাঙতে চায়।

চীনের ভারতবর্ষকে টুকরো করার সাহসের মূলে আছে, আমাদের বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ এবং বর্তমানে ভোগসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রেম শূন্য দেশের জনসাধারণ। চীনা সরকার ভাবছে ১৯৬২ সালে একতরফাভাবে ভারতকে আক্রমণ করে, অতি সহজে ভারতের যে বিশাল ভূখন্ড দখল করে রেখেছে, ঠিক সেইভাবে বর্তমানেও পরিকল্পনা রূপায়ণ করবে।

সেই ১৯৬২ সাল আর বর্তমানে ২০১০ সাল শুরু হতে যাচ্ছে। চীন এতদিন ধরে ভারতবর্ষের বিশাল ভূ-খণ্ডকে অন্যায়ভাবে নিজের দখলে রেখেছে। সেই হারানো ভূ-খন্ডকে আজও পুনরুদ্ধার করতে না পারার অপমানের জ্বালা, সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রপ্রেমী হিন্দু সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এই ৪৮ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের শক্তির অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপ্রেমী জনসাধারণের মনসিকতারও বিশাল পরিবর্তন এসেছে। ভারতবর্ষ বর্তমানে বিশ্বের যে কোনও শক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর দিকে তাকালেই তা আমরা বুঝতে পারি।

দিলীপ ময়রা, কাশীনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

দেহ তল্লাশি

মার্কিন বিমান সংস্থা 'কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইন্স'-এর কর্মীরা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ও ভারতরত্ন ডঃ এ পি জে আবদুল কালামকে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁর নিউইয়র্ক যাত্রাকালে যেভাবে দেহ তল্লাশি চালিয়েছেন তা শুধু নিন্দাই নয়, ক্ষমারও অযোগ্য। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৪ এপ্রিল। কিন্তু সম্প্রতি ঘটনাটি জানাজানি হতেই দেশ জুড়ে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। দলমত নির্বিশেষে সবাই করেছেন এর তীব্র নিন্দা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত বিমানসংস্থার কর্মীরা এতটা ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের সাহস পেলেন কোথা থেকে? তাঁরা কী জানেন না যে ডঃ কলাম হলেন এদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। জেনে-শুনেও কেন তাঁকে এহেন হেনস্থা?

অবশ্য বিমান সংস্থাটি নিজেদের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছে, ওটাই নাকি স্বাভাবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সংস্থাটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, ডঃ কালাম নাকি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। এ যেন 'চোরের মায়ের বড় গলা!' কিন্তু সংস্থাটির নিয়ম-নীতিতে যদি একজন সাধারণ যাত্রী ও একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই থাকে, তাহলে সংস্থার কর্মকর্তারা ডঃ কালামের দেহ তল্লাশির কারণ ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে জানিয়ে দিতে পারতেন ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই। অথচ তাঁরা কিন্তু তা করেননি। দীর্ঘদিন পরে এখন ঘটনাটি জানাজানি হতেই অবস্থা বেগতিক বুঝে তাঁরা ঘটনাটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। এটা 'জুতো মেরে গো-দান'-এর সামিল নয় কী?

সত্যি বলতে কী, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকার রয়েছে প্রচণ্ড অহমিকা ও দুঃসাহস। তারা তৃতীয় বিশ্বকে দেখে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। কাজেই ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনও তাদের কাছে ছিল গুরুত্বহীন। অবশ্য যারা অন্যকে সম্মান জানাতে জানে না, তারা নিজেরাও সম্মান পায় না।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

থিমের দুর্গা শুধুই উৎসব, পুজো নয়

নন্দলাল ভট্টাচার্য

পুজোর ঢাকে কাঠি। মা আসছেন। বছর পরে শরৎকালে। দিন গোনা তার শুরু হয়ে গেছে। তবে উল্টো দিক থেকে। ওটাই এখন রেওয়াজ। অবরোহন নয়, অবতরণ। ওঠা নয়, নামা। ১, ২, ৩ ..... নয়, ... ৩,২,১ এই আর কী। এবং এখন এটা শুরু হয়ে যায় পুজো শেষ হবার প্রায় পরের দিন থেকেই। দৌড় শুরু 'থিম'-এর

কারণেই। না দৌড়ে উপায় কোথায়? শারদোৎসব যে এখন থিমোৎসব। অতএব ভরসা উলটপুরাণ।

বারোয়ারি বা সার্বজনীন পুজো তখনও তেমন চালু হয়নি। বাড়ির পুজোই বাঙালির দুর্গা পুজো। তোড়জোড় শুরু হত তখনও পুজোর বহু আগে থেকেই। পুরাণের নির্দেশ মেনে, পাঁজি-পুঁথি দেখে শুরু হত কাঠামো পুজো। কারও স্নান যাত্রায়, কারোও বা রথের দিনে। তারপর সেই কাঠামোয় খড় দিয়ে তৈরি হত প্রতিমার 'মেড়'। পড়তো মাটি। এক মেটে, দো মেটে, বসত প্রতিমার মুণ্ড। তারপর রং। পাঁজি দেখেই প্রতিমার চোখ আঁকা। ঘাম তেল মাখানো। এইসব আর কী? এবং সেই প্রতিমাও তৈরি করা হতো দেবীর ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ীই। অতসী ফুলের মতো হবে দেবীর গায়ের রং। চোখ হবে দীর্ঘ প্রায় আকর্ণ বিস্তৃত। অসুরের রং হবে সবুজ। সরস্বতী সাদা, লক্ষ্মী একটু কমলা ঘেঁষা হলুদ। গণেশ লাল, কার্তিক সাদা কিংবা হলুদ। সবই ধ্যানমূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে দৃশ্যমান বিগ্রহ আর ধ্যানমূর্তি একাকার হয়ে যেত পুরোহিতের চিদাকাশে। সমবেত ভক্ত পূজার্থীদেরও।

গেছে সে সব দিন। গতা সা দিবসা। আক্ষেপে লাভ নেই। এমনটাই হয়। তাই দুর্গা পূজা হয় দুর্গোৎসব — আরও এগিয়ে শারদোৎসব। পূজা, উপাসনা আর উৎসবের মধ্যে ফাঁক তো একটা থাকবেই। একটাকে মানা-টানা তো পড়বে আর একটাতেই। ফলে বাড়ির পুজোর বারোয়ারি বাড়-বাড়ন্ত। 'সবার পরশে' মঙ্গ লঘট ভরতে গিয়ে একসময় উধাও পূজার বিশুদ্ধ তা নিয়ম কানুন। এবং একসময় তা দাঁড়ায় প্রায় পুতুল খেলায়। নিষ্ঠা আন্তরিকতার পরিবর্তে আড়ম্বর। সেই আর কী, বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।

একচালার ঠাকুর হল আলাদা আলাদা। সাবেকি ঠাকুরের জায়গা নিল আর্টের ঠাকুর। প্রতিমা শিল্পীরা জনরুচির তাগিদেই আগের রীতি ভুলে প্রতিমা নির্মাণে শিল্পের ছোঁয়া দিতে থাকলেন। মূর্তির রূপে এল পরিবর্তন। মাটির প্রতিমা ক্রমশ হয়ে উঠল নায়ক-নায়িকার হুবহু প্রতিমূর্তি। তার গায়ের রং পোষাক পরিচ্ছদ — সব কিছুতেই দিন বদলের রং। পুরোহিত আর তখন দেবীমূর্তির দিকে তাকিয়ে পুজো করেন না। করতে পারেন না। কেননা ধ্যান-মূর্তির সঙ্গে মেলে না যে সে প্রতিমা। ফলে আচার-অনুষ্ঠান সবই হয়, শুধু পুজোটা ছাড়া। না, বোধহয় ভুল হয়ে গেল। দেবীমূর্তি তখন উপলক্ষ মাত্র, পুজোটা সারা হয় ঘটেই।

পুজো আর উৎসবের এই বহিরঙ্গের বাহার — এর কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ — তা নিয়ে বিতর্ক অনেক হয়েছে, আজও হচ্ছে। হয়তো হবেও। এবং সেটাই বোধহয় রীতি। তাই বাদ যাক সে কথা। বরং থিমোৎসব নিয়ে উঠে আসা সাম্প্রতিক নানা কথা নিয়েই নাড়াচাড়া করা যাক কিছুক্ষণ।

মোটামুটিভাবে নয়ের দশক থেকেই শুরু হয়ে গেছে থিমের পুজো। শুরুটা যেমনই হোক এখন কিন্তু থিম-এর সন্ধানে বিচরণ যত্রতত্র। তার চেয়েও বড় কথা 'থিম' এখন অনেকটাই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে। বিশ্বায়ন তথা বাজারি অর্থনীতির হাট-খোলা দরজা-জানালা দিয়ে হু হু করে বয়ে যাওয়া বাতাসের সঙ্গে উড়ে আসা এঁটো পাতার জঞ্জালে ভরে যাচ্ছে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র। পুজোও এখন সেই বাজারি কর্তাদেরই হাতে। অনেক কিছুর মতোই বাজারে এখন থিম ম্যানেজমেন্টের রমরমা। পুজো নিয়েও জমে উঠেছে তাই এক ধরনের বাজারি প্রতিযোগিতা, ব্যবসাও। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতোই এক ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার চাপে পুজোরও প্রায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। এবং সেই এখন শুধুই উৎসব, বাজার ধরা, পুজো নয় কখনই।

থিমের এই বাজারিকরণ এবং পুজোর বাণিজ্যকরণ নিয়ে আরও আলোচনার আগে বরং আমাদের মূর্তিপুজোর ইতিহাস নিয়ে একটু নড়াচাড়া করা দরকার। বেদে মূর্তিপূজার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। যদিও বেদে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। সেসব দেবমূর্তির কল্পনায় ঋষিরা জনমানসের স্বাভাবিক ভয় এবং শ্রদ্ধার কথাটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, এমনই বলে থাকেন কেউ কেউ।

ভারতীয়দের মূর্তিপূজা দেখে বিশেষ করে খৃস্টান ও মুসলমানরা ভারতকে পৌত্তলিক বলে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট। তাদের দেশের কোনও মূর্তিপূজা চালু থাকলেও তাতে একেশ্বরবাদের ছিটেফোঁটাও ছিল না। ভারতে ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে রয়েছে বহুত্বের মধ্যে একত্বের অধিষ্ঠান। তাই অন্যান্য জায়গায় বিগ্রহগুলি সরাসরি দেবতা হলেও ভারতের দেবতারা স্বর্গবাসী হয়েও চৈতন্যস্বরূপ। এখানে চেহারা বাহ্য, পুজো হতে পারে ঘটেও। নিজেকেই দেবতায় উন্নীত করে পূজক করেন পূজা। সে কারণেই ব্রাহ্মণগুলিতে পুজোর নানা নির্দেশ থাকলেও মূর্তি গড়ে পুজোর কোনও কথা নেই। গুপ্তযুগ বা পৌরাণিক যুগেই এদেশে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন হয়। এমনটাই বলে থাকেন 'ঐতিহাসিকরা। এবং মূর্তি গড়ার উপাদান হয় মাটি, পাথর বা নানা ধাতু। সেই পথ ধরে কি এখন কাঠি, শিশি, বিস্কুটে অবনমন?

বেদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে থিমের পুজো নিয়ে তেমন আপত্তি করার কিছু থাকে না। যদিও থিমের ধাক্কায় পুজো বা আধ্যাত্মিকতার আধার থেকে সরে শুধুই উৎসবে মাতাকে সমর্থন করবেন না অনেকেই। আর এখনেই শাস্ত্রবিদ্‌রা একটা বড় ভূমিকা নিতে পারেন।

পুজোর ক্ষেত্রে প্রতিমা পুজো নয়, ঘটের ওপরই শাস্ত্রানুযায়ী শুদ্ধাচারে এবং রীতিসম্মতভাবে পুজোর ওপর গুরুত্ব দিতে পারেন তাঁরা। প্রতিমা নয়, ঘটের শুদ্ধ তা রক্ষা করার কথাও বলতে পারেন তাঁরা এমন কি অঙ্গুলির ফুল-বেলপাতা ঘটের ওপর ফেলার নির্দেশ দিতে পারেন এবং সেটা করলেই সম্ভবত পুজোর বিশুদ্ধ তা রক্ষা করা যাবে। পুজোজনিত ত্রুটির ফলে যে অমঙ্গলের শঙ্কা জাগে জনমনে তারও নিরসন করা যাবে সেভাবেই। পুজো তখন সর্বার্থেই হয়ে উঠবে পুজো।

আর থিম-এর পুজো সে তো শুধুই উৎসব। দুর্গাপুজো যবে থেকে শারদোৎসব — সেদিন থেকেই তো খুলে গেছে এই উৎসবের দুয়ার। তাই পুজো থাক পুজোতে। উৎসব উৎসবেই।

ব্যতিক্রমী দুর্গাপুজো

বৈদেহীনন্দন রায়

বাঙালী বরাবরই ব্যতিক্রমী। নতুন নতুন ভাবনার রঙিন আবেশে সর্বদা মশগুল। নাহলে বাঙলার বুকে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু প্রভৃতি মহামানব ও মনীষীদের আবির্ভাব কেন? তখন ছিল মনীষার বিচ্ছুরণ। আর এখন বন্ধ্যাত্বের বিকিরণ। সেটা ছিল মাইকেল কবির 'হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন'-এর যুগ। এখন

কেবল — 'আপনি কুঠার মারি আপনার পায়ে।' অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত দুর্গোৎসব নিয়ে বাঙালী তো নানা কেরামতি দেখিয়ে আসছে। সে যুগে যা ছিল বাবুবিলাস। এখন তা দাদাবিলাস। আগে দুর্গোৎসব হোত বাংলার নব্য জমিদার ও কলকাতার বাবুদের বাড়িতে। পুজোর থেকে আমোদ-আহ্লাদ-স্ফূর্তির এলাহি আয়োজন। বাঈজী নাচ, তরজা, হাফ আখড়াই, সঙ্গে সাহেব সুবোদের জন্য দেদার মদ্য আপ্যায়ন। কারণ-বিলাস এখনও আছে দাদাদের পুজোয়। তবে আঠেরো শতকের থিমে নয়। এখন থিম প্রতিমার রূপায়ণে (পেরেকের প্রতিমা, ভাঁড়ের প্রতিমা, মুদ্রার প্রতিমা ইত্যাদি), প্যান্ডেলের বাঁধনে, রূপালী পর্দার নায়ক-নায়িকাদের আবাহনে আর মাইকের তান্ডবে। গত বছর এক পত্রলেখক বহুল প্রচারিত একটি বাংলা দৈনিকে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন — "আজকের দিনে পুজোতে লক্ষ্যের থেকে উপলক্ষই বড়। পুজোর জন্য যা খরচ হয়, তার কতগুণ প্যান্ডেলে, আলোক ও মাইকে তা সহজেই অনুমেয়। তবুও এসব পুজোতে পৃষ্ঠ -পোষকতা করতে দেখা যায় সমাজের ধারক ও বাহক নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের"। এদের সঙ্গে সানাইয়ের পোঁ ধরেছে কিছু কর্পোরেট হাউস আর বাজারী সংবাদ মাধ্যম। বাঙালীর বাঁজা মানসিকতার আহাম্মকি প্রদর্শনে এরা অতি তৎপর। ঘোষণা করছে শ্রেষ্ঠ বন্ধ্যাত্বের শিরোপা।

আসলে হিন্দু বাঙালী জীবন থেকে ঐতিহ্যের আকর্ষণ, ভাবনার আলোড়ন, সদিচ্ছার বিকিরণ, নিজ ধর্মের প্রতি মর্যাদা সব হারিয়ে যেতে বসেছে। বাংলার মাটিতে থিক্ থিক্ করছে বন্ধ্যা মানসিকতাগ্রস্ত মানুষ। বিলুপ্তপ্রায় হতে চলেছে বোঝদার বাঙালীর সংখ্যা। এঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছে বঙ্গজীবনের সুস্থ মানসিকতাকে। এঁদের পুজোর মধ্যে আজও পাওয়া যায় স্বর্গীয় আবেগ। শারদীয়া দুর্গাপুজোর দার্শনিক মহিমা জেগে আছে এঁদের পুজোর দালান বা চন্ডীমন্ডপে। শহুরে থিমওয়ালারা যতই চমক-জমক দেখাক পুজোয় ব্যতিক্রমী প্রদর্শনে, প্রকৃত ঐতিহ্যপ্রেমী বাঙালীদের কাছে এঁরা নেহাত বালখিল্যের অবস্থায়। এঁদের ব্যতিক্রমী পুজোর মধ্যে বেঁচে আছে বছরের পর বছর লোক কাহিনী, দিব্যানুভূতি আর পরম্পরার অপূর্ব মিশ্রণ। সেই ব্যতিক্রমী কিছু শারদীয়া পুজোর কথায় আসা যাক্।

বাইশ মূর্তির প্রতিমা — এই পুজোর স্থান রানীনগর (মুর্শিদাবাদ) থানার ইসলামপুর গ্রাম। গ্রামে মুসলিমরাই সংখ্যাধিক্য। তবুও পুজো হচ্ছে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে। প্রতিমার সংখ্যা ২২। তাই বাইশ মূর্তির প্রতিমার অভিধা। এখানে দেবী দুর্গার সাথে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ, মহিষাসুর সহ থাকেন বৃষ বাহনে শিব, হংসারূঢ় ব্রহ্মা, গরুড় পৃষ্ঠে বিষ্ণু, শিব অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গী , দেবীর সহচরী জয়া-বিজয়া, অর্ধবৃত্তাকার চালচিত্রের নীচে দুটি মকর মূর্তি। এসব নিয়েই বাইশ মূর্তি। ভোগও নিবেদন হয় ২২ মূর্তির। কথিত যে কাশিমবাজারের রাজারা এই পুজোর প্রবর্তক। কারণ স্বপ্নদর্শন দেবীর এই বিচিত্র প্রতিমার।

প্রতিমা যেখানে জোড়া তরোয়াল — পুরুলিয়ায় পুঞ্চা থানা এলাকায় কৈড়া গ্রাম। এখানে তিনশ বছর ধরে চলছে প্রতিমার বদলে তিনফুটের জোড়া তরোয়াল পুজো। নাম জয়-বিজয়। মহাষ্টমী যেহেতু বীরাষ্টমী ও আয়ুধ পূজার জন্য নির্দিষ্ট, সেদিন থেকে তিনদিন হয় এই তরোয়াল পুজো। ইতিহাস সূত্র অনুসারে পঞ্চ কোটের রাজার অধীন কিছু সামন্ত রাজা বা জমিদার রাজ-নির্দেশে পুজোর ব্যবস্থা করেন। কৈড়া গ্রামের সিংহপাতর জনজাতি সম্প্রদায়রা ছিল যোদ্ধা শ্রেণীভুক্ত। তাদের সামন্তরাজা এই তরবারি পুজোর প্রচলন করেন বিজয় অভিযানের স্মারক হিসেবে। শোনা যায় এই পুজোর উদ্ভব ১১০০ বঙ্গাব্দে। পুজো

(এরপর ১৪ পাতায়)

জন হিতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বামী রামতীর্থ একদা ঋষিকেশে (উত্তরাখন্ড) গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ভোর বেলা। তখনও গঙ্গার তীরে অতটা ভিড় জমেনি। সবেমাত্র লোকজনের আশা-যাওয়া শুরু হয়েছে। রামতীর্থ ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে গল্প করছেন, কথা বলছেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে একজন সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসীর গায়ের রঙ গৌর বর্ণের। শরীর গেরুয়া পোশাকে ঢাকা। এই নদীর ধারে তাঁকে আগে দেখেননি রামতীর্থ। তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। নমস্কার জানালেন। সন্ন্যাসীও প্রতি নমস্কার জানালেন। রামতীর্থ নিজেই প্রথমে পরিচয় দিলেন। স্বামী রামতীর্থের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সন্ন্যাসীও খুশী হলেন।

কথা প্রসঙ্গে আলাপ জমে উঠল দু'জনের মধ্যে। কথায় কথায় রামতীর্থ জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ, আপনি কত বছর ধরে সন্ন্যাস ব্রত পালন করছেন? মহারাজ একটু অহঙ্কারের সুরে বললেন, চল্লিশ বছর ধরে আমি সন্ন্যাসী।

রামতীর্থ — তাহলে আপনি বেশ অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা আপনার রয়েছে। আচ্ছা, আজ পর্যন্ত আপনি কোন কোন বিদ্যায় সিদ্ধি লাভ করেছেন?

মহারাজ — আপনি সামনে যে নদী দেখছেন, এটা আমার কাছে সাধারণ রাস্তার

বোধ কথা

মতোই। আমি অনায়াসে নদীর এপার থেকে ওপারে যেতে পারি। আমি এক্ষেত্রে সফল হয়েছি। সিদ্ধি লাভ করেছি।

রামতীর্থ — তাহলে আপনি ওপার থেকে এপারেও আসতে পারবেন নিশ্চয়।

মহারাজ — হ্যাঁ, এটা আর নতুন কী। আমি নদীর ওপর হেঁটে ওপার থেকে এপারে যাওয়া আসা করতে পারি। এটা আমার কাছে খুব সাধারণ ব্যাপার।

রামতীর্থ — হাসলেন। নিজের মনের কথা চাপা রাখতে না পেরে বললেন, সামান্য এই বিদ্যা শিখতে আপনি চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিলেন!

মহারাজ — কেন এই বিদ্যাটা কম কিসের। এটা তো কোনও ফেলনা বিদ্যা নয়। এটাও তো সিদ্ধি লাভ।

রামতীর্থ মহারাজ উত্তরে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু দেখুন, একটা নৌকার সাহায্যে যে কেউই নদীর এপার-ওপার করতে পারে। এটার মধ্যে নতুনত্ব তো কিছু নেই। আর তাছাড়া আপনার এই বিদ্যায় আর পাঁচজনের কি কোনও উপকার হবে! অথচ আপনি চল্লিশটা বছর এতে কাটিয়ে দিলেন। আপনার এমন বিদ্যাই শেখা উচিত ছিল, যা দশের উপকারে লাগবে। সিদ্ধি লাভ শুধু নিজের জন্য নয়। সবার জন্য।

সন্ন্যাসী মহারাজ মনে মনে লজ্জিত হলেন। ভাবলেন, রামতীর্থের কথা ঠিক। সন্ন্যাস জীবন তো দশের জন্যই। আমার যে বিদ্যা দশের উপকারে লাগবে না, তা শিখে আসার তো কোনও লাভ হল না।

।। চিত্রকথা ।। হনুমান ও ভীম ।। ৩

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

শেষ পর্যন্ত ৬ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ চীনের প্রাচীরকে টক্কর দিয়ে ফেলল, আর্জেন্টাইন অ্যান্ট নামে লিনেপিথেমা হিউমাইল প্রজাতির পিঁপড়ে। ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এরা সুদীর্ঘ এক কলোনি বানিয়েছে। আমেরিকা, স্পেন, পর্তুগাল, জাপানের কোবে অঞ্চল এবং পশ্চিম উপকূল জুড়ে রয়েছে পিঁপড়ে সভ্যতার বিস্তার। মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই এরা এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব কলোনির পিঁপড়েদের স্বভাব চরিত্র নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, জাপানের ভিন্ন কলোনির পিঁপড়েদের মধ্যে সদ্ভাব নেই মোটেই, অথচ ইউরোপের পিঁপড়েদের সঙ্গে জাপানের পিঁপড়েদের দেখা হলে অ্যান্টেনায় অ্যান্টেনা ঘষে সে কী আদিখ্যেতা!

❖ ❖ ❖

সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁকে এক ডাকে চেনেন 'লেনিন' ছদ্মনামে। এবং এই ছদ্মনামটাই এখন তাঁর আসল নাম। নইলে লেনিনের মা-বাবার দেওয়া নাম ছিল ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। স্কুল কলেজের সহপাঠীরাও এই নামেই তাঁকে চিনতেন এবং ডাকতেন। দেশের কাজ করতে গিয়ে তাঁকে ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে হয়েছে শুধু একবার নয়, ১৫৯ বার। ওই ১৫৯টি ছদ্মনামের একটা লেনিন, আজও অমর হয়ে আছে। বাকিগুলো জানেন গবেষকেরা!

❖ ❖ ❖

এক নারী সান্নিধ্য প্রয়াসী মার্কিন ট্যুরিস্ট খুব তাড়াহুড়ো করে প্লেনে ওঠার আগে বিমান বন্দরের বুকস্টলে একটি বইয়ের শুধু টাইটেল দেখেই চটপট বইটি কিনে নিলেন। বইয়ের নাম 'হাউ টু হাগ'। প্লেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পাশের সুন্দরী সহযাত্রীর দিকে মৃদু হাসি বিলিয়ে বইটি খুলে বুঝলেন, সেটা আসলে খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত অভিধানের একটি খন্ড, যার প্রথম শব্দ হুগ্ধ এবং শেষ শব্দ হুগুগু(নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করা)।

❖ ❖ ❖

মা ক'দিনের জন্য অন্যত্র গিয়েছেন। এই সুযোগে তাঁর মেয়ে আনাত বদলে ফেলল বিছানার পুরনো তোষকটা। পুরনো তোষক ভ্যাটে, খাটে উঠেছে-ব্র্যান্ড নিউ গদি — মায়ের জন্য সারপ্রাইজ! মা চমকালেন তো বটেই, প্রায় মূর্ছা গেলেন। ওই পুরনো তোষকের পেটে লুকনো ছিল তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় — দশ লক্ষ ডলার। শুনে এবার মেয়েরই ভিরমি খাওয়ার পালা। টাকার শোকে পাগল আনাত প্রাণপণে ঘাঁটলেন সারা শহরের আবর্জনা। কিন্তু পাওয়া গেল না তোষক।

❖ ❖ ❖

পৃথিবীর সপ্তম ধনী হায়দরাবাদের নিজাম বাড়িতে অতিথি এলে শুধু এক কাপ চা, একখানা বিস্কুট আর একটা সিগারেট দিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করতেন। অতিথি চলে গেলে নিজাম নাকি ছাইদানে পড়ে থাকা সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে নিজে ধরাতেন। অথচ এই নিজামই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের খরচ বাবদ বৃটিশ কোষাগারে প্রায় আড়াই কোটি পাউন্ড দান করেছিলেন। তখনকার হিসেবে টাকার অঙ্কটা দাঁড়ায় প্রায় নববই কোটি।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

বাবা : কীরে, প্রশ্নগুলো জানা পড়েছিল?

ছেলে : হ্যাঁ বাবা, শুধু উত্তরগুলো অজানা।

☺ ☺ ☺

ডাক্তার : আপনার কানের অপারেশন খুবই সাকসেসফুল হয়েছে। এখন আর কোনও অসুবিধে হবে না, পরিষ্কার শুনতে পাবেন।

রোগী : ডাক্তারবাবু, আমায় কিছু বলছেন?

☺ ☺ ☺

বাবলু : বল তো, বিদ্যুৎ আর বজ্রপাতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

টুবলো : তাও জানিস না, বিদ্যুতের জন্য মোটা টাকার বিল পে করতে হয়, আর বজ্রপাতের জন্য কানাকড়িও লাগে না।

☺ ☺ ☺

শিক্ষক : কী রে, ক্লাসে ঘুমোচ্ছিস কেন?

ছাত্র : আপনি যা জোরে কথা বলছেন, ঘুমোনো যায় নাকি।

☺ ☺ ☺

প্রশ্ন : ড্রাকুলা কোন্ ব্যাঙ্কে যায়?

উত্তর : ব্লাড ব্যাঙ্কে।

—নীলাদ্রি

মগজ চর্চা

—নীলাদ্রি

১। পপ্ স্টার মাইকেল জ্যাকসন যে-ধরনের নাচ নাচতেন তাকে কী বলে?

২। ভারতের কোন্ প্রতিবেশী রাষ্ট্রে রেলপথ নেই?

৩। মিকি-মাউস-এর আগে ওয়াল্ট ডিজনি তৈরি করেন 'অসওয়াল্ড'। সেটা কি প্রাণী?

৪। কোন সংস্থা ভারতে শিক্ষামূলক রেডিও চ্যানেল 'জ্ঞানবাণী' প্রতিষ্ঠা করে?

৫। কাকে বলে 'কিং অব্ স্পোর্টস্'?

উত্তর ঃ

১। মুনওয়াক।

২। আফগানিস্তান।

৩। খরগোশ।

৪। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি।

৫। পর্বতারোহণকে।।

বাংলায় কর্মহীন বিশ্বকর্মা

সতীনাথ রায়

দু'দিন ধরে চোখে ঘুম নেই নীলুবাবুর। একবারের জন্যও চোখের পাতা দুটো এক করতে পারেননি। সামনেই বিশ্বকর্মা পুজো। পুজোর আগে এভাবে কাজ চলে যাওয়ার দুঃখটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি। নিজের স্ত্রীকেও বলতে পারেননি দুঃসংবাদটি। পাছে কষ্ট পায়। বাড়ির লোক যাতে বুঝতে না পারে, তাই নিয়মিত কাজে বের হন তিনি। বাইরে এদিকে-সেদিকে সময় কাটিয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসেন। সংসারের মুখ তাকিয়ে এই অভিনয়টা না করলেই নয়। সেদিন নৃপেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল নীলুবাবুর। নৃপেনবাবু ডানলপের কারখানায় চাকরি করতেন। ভালো পোস্টে ছিলেন। বিশ্বকর্মা পুজোর আগে তাঁর কাজও চলে গেছে। শোনা যায় ইউনিয়নবাজিই নাকি এর কারণ। খোলার আশাও খুব কম।

নৃপেনবাবুর মুখেই নীলুবাবু জানতে পারলেন বিশ্বজিতের কথা। দক্ষিণ পাড়ার বিশ্বজিৎ দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক কারখানায় লেবার ছিল। সবে মাত্র বিয়ে করে সংসার শুরু করেছে। ওরও কাজ নেই দু'মাস ধরে। কারখানা নাকি বন্ধ। পাড়ার হারু কাকার দোকানে দেখা হয় একে অপরের। কাজ হারানো দুঃখ নিয়েই সেদিন চায়ের আড্ডা বসেছিল হারু কাকার দোকানে। কথায় কথায় নীলুবাবু জানতে চাইলেন, নৃপেনদা, আমাদের রাজ্যেই শুধু এমনটা হয় কেন বলুন তো। একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হচ্ছে। খোলারও নাম নেই। দেখা যাচ্ছে পর্টির হাতে পড়ে বন্ধ কারখানার জমিও নাকি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। নৃপেনবাবু অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বড় বড় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ওঠাবসা। তাছাড়া খবরের কাগজও পড়েন অনেক। অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকেই কিছু শোনাতে লাগলেন। বললেন, এটা বাম রাজ্য। এখানে এমনটাই হয়। সরকার উদাসীন। ভ্রুক্ষেপ নেই বন্ধ কারখানা নিয়ে। অথচ নতুন করে শিল্প গড়ার স্বপ্ন দেখায়। বলে কৃষি আমাদের অমুক, শিল্প আমাদের তমুক আরও কত কী। আসলে এসবই ভাঁওতা।

ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের ওপর তৃতীয় সমীক্ষার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে এরাজ্যে বন্ধ সংস্থা ২৬,০৮০টি। রুগ্ন বা মৃতপ্রায় ক্ষুদ্রশিল্প রয়েছে ৫০,৫৯৭টি। রেজিস্টার্ড অফ ফ্যাক্টরীর নথি অনুযায়ী বড় ও মাঝারি ফ্যাক্টরী বন্ধ রয়েছে ৩৪৩টি। বি আই এফ আর-এ পশ্চিমবঙ্গে রুগ্ন শিল্প সংস্থা ৩৩৪টি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত ২৫টি সংস্থা। ১৯৮০ সালে এই রাজ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক ছিল ২৬,৬৪,০০০ জন। বছর বছর রাজ্যে শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০০৪-এ তা কমে হয়েছে ২২,৩০,০০০ জন। বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার অবস্থা বদলাতে এরাজ্যে সরকারিভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। বৃটিশ আমলের ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পকে পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার এখনও কোনও সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বামফ্রন্ট সরকার অবশ্য দাবী করে থাকে তাদের নির্দিষ্ট একটা শিল্পনীতি রয়েছে। আদতে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট কোনও শিল্পনীতিই নেই। বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কিছু নির্দেশিকা রয়েছে। যা কোনও শিল্প নীতি নয়। ১৯৭৭-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের সাফল্যের কথা প্রচারের জন্য যে পুস্তিকাগুলি প্রকাশ করেছে, সেগুলির একটিতেও শিল্প নীতির কোনও কথা উল্লেখ নেই। ১৯৯৮ সালে সরকার বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য ৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। যার মধ্যে সরকার মাত্র ২২ কোটি টাকা খরচ করতে পারে বলে খবর।

২০০১-০২ সাল নাগাদ রাজ্য সরকার 'ওয়েবকন' সংস্থার দ্বারা একটি সমীক্ষা চালায়। ৫০০টি বড় ও মাঝারি বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে তার মধ্যে ৯৮টি বন্ধ। বাকিগুলো মৃতপ্রায়। ওই ৯৮টি বন্ধ সংস্থার বিপুল পরিমাণের জমির পরিমাণ হল ৪১ হাজার ৭৮ একর। বাম রাজত্বের নিয়মে আজ সেগুলির ওপর পার্টির ক্যাডারদের হাত।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, নিরুপম সেনরা রাজ্যের শিল্পের দুর্দশার জন্য কেন্দ্রীয় নীতিকেই বারবার দায়ী করেন। কেন্দ্রের কিছু নীতি রাজ্যের শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে পথের কাঁটা হলেও, বামফ্রন্ট সরকার ৩২ বছর ধরে একবারের জন্যও তার প্রতিবাদ করেনি। ফলে নতুন কারখানা তো দূরঅস্ত, বন্ধ কারখানার

সংখ্যা বাড়ছে দিনকে দিন।

নৃপেনবাবু বললেন, পাশের হাওড়ার দিকটাই দেখুন না। হাওড়ার নটবর লাল রোড, বেনারস রোড, বেলগাছিয়া, শালকিয়া, ঘুসুড়ি, দাশনগর, বালটিকুরি রোড একসময় কারখানার স্বর্গরাজ্য ছিল। রোজগারের টানে কাতারে কাতারে শ্রমিকরা ভিড় জমাতো। বেনারস রোড ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় বারোশো শিল্পের মধ্যে অধিকাংশই এখন বন্ধ। এই অঞ্চলে ১২টি স্লিপার ছিল। আজ এই সবগুলিই বন্ধ। ১৩টি রেলিং মিল ছিল। এখন ১১টা বন্ধ। লেদ মেশিনের কারখানা তৈরিতে কেউ এগিয়ে আসে না।

১৯৮৯ থেকে হাওড়ার অধিকাংশ ময়দা মিল বন্ধ। ওই মিলগুলিতে একসময় ১০ হাজার মেট্রিক টন ময়দা বিক্রি হতো। কিন্তু আজ এসবই অতীত। হাওড়া ফ্লাওয়ার মিল, গঙ্গা ফ্লাওয়ার মিল, শ্রীকৃষ্ণ ফ্লাওয়ার মিল, রিফর্ম ফ্লাওয়ার মিল সহ বেশ কিছু ময়দা কারখানা বন্ধ। উলুবেড়িয়া, বাউরিয়া, চেঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলে জুট মিল বন্ধ।

হুগলীর চিত্রটা দেখুন, হুগলী জেলাতে সরকার সিঙ্গুরের গাড়ি তৈরির কারখানায় মেতে ওঠে। অথচ এরাজ্যের অন্যতম শিল্পবন্ধু হুগলীতে অধিকাংশ কারখানা বন্ধ। যেগুলি টিকে রয়েছে তার অবস্থাও ভালো নয়। হুগলী জেলায় উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে রয়েছে পাটশিল্প। ভারতের প্রথম পাটকল ১৮৫৩-এ হুগলীর রিষড়ায় প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে জেলায় ১০টি পাটকল চালু আছে। তাদের অবস্থাও ভালো নয়। বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। পাটকলগুলিকে ঘিরে রয়েছে বিশাল সম্পদ। সরকার মোটেও পাটকলের উন্নয়ণে আগ্রহী নয়। হুগলীর মধ্যে রিষড়া অন্যতম শিল্প সমৃদ্ধ পৌর এলাকা। হুগলীর জে কে স্টীল, রামপুরিয়া কটন মিল, বঙ্গেশ্বরী কটন মিল, ইউনাইটেড ভেজিটেবিল, শ্রীরাম সিল্ক, কুসুম, জয়শ্রী টেক্সটাইলস্, হিন্দুস্থান গ্লাস সহ শ্রীইঞ্জিনীয়ারিং-এর মতো কারখানাগুলি শুধুই বন্ধ কারখানার তালিকায়। শ্রমিক বিক্ষোভের কারণে ১৯৮৪ সালে বন্ধ হয়ে যায় জে কে স্টীল। পরবর্তীতে তা রিষড়া স্টীল নামে চালু হয়। ১৯৯৮-এ তাও বন্ধ হয়ে যায়। ৩০ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা এই কারখানার অধিকাংশ যন্ত্রাংশ বিক্রি হয়ে গেছে। যার নেপথ্য নায়ক সিপিএম। ফাঁকা জমিটা পড়ে রয়েছে। স্থানীয় মানুষের ধারণা তাও বিক্রি হয়ে যাবে। রিষড়ার প্রেসিডেন্সি জুটমিল গত শতকের আশির দশকে বন্ধ হয়। বন্ধ কারখানার জমি এখন প্লট করে বিক্রি হচ্ছে। শ্রীরামপুরে মাহেশে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ২০০০ সালে বন্ধ হয়। এখানেও কারখানার যন্ত্রাংশ সমাজবিরোধীদের হাত ধরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীরামপুরের জি টি রোডের ওপর এশিয়া রোলিং বন্ধ। বন্ধ ব্যান্ডেল মগরায় ইস্ট এন্ড পেপার মিল, হুগলীর সর্বোদয় রবার, এন কে স্টীল, উইন্ডো গ্লাস, বাঁশবেড়িয়া কাঞ্চন কেমিক্যাল, সেনকো বিস্কুট কারখানা, নীলা বিস্কুট, চুঁচুড়া গ্লাস ফ্যাক্টরী। শুধু এটাই নয়। বন্ধের বৃহৎ তালিকায় রয়েছে বিষড়ার শঙ্কর টিউবস্, এইচ গুরু ইণ্ডাস্ট্রী, ইউ ভি এম, প্রীতি প্রেসার, দেব স্টীল, ইস্টার্ন রোলিং মিল প্রভৃতি। এই সমস্ত বড় মাঝারি বন্ধ কারখানার জমি আবার উদ্ধারের চেষ্টা সরকার করেনি। প্রমোটারদের হাত ধরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে একের পর এক বন্ধ কারখানার জমি। ডানলপের জমি হস্তান্তর হচ্ছে শুনে ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা হুগলীর জেলা অফিসকে নির্দেশ দেয় ডানলপের জমি হস্তান্তরের যেন অনুমতি না দেওয়া হয়। কিন্তু ছোটো বড় বন্ধ কারখানার জমি চোখের সামনে বিক্রি হলেও, সরকার নীরব। হিন্দমোটর গাড়ি কারখানার ৭৪০ একর জমির মধ্যে ৩১৪ একর জমিতে আই টি হাব, আবাসন প্রকল্পের জন্য অনুমতি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় মানুষদের মতে, শিল্পের জন্য সস্তায় জমি কিনে কর্তৃপক্ষ তা মোটা টাকায় বিক্রি করছে। যাতে মোটা টাকার মুনাফা হয়। ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে ব্যারাকপুরের শিল্পাঞ্চল। কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। এক সময় কাঁচরাপাড়া রেল কারখানা থেকে শুরু করে টায়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড, এক্সাইড ব্যাটারির কারখানা সহ কমবেশি অনেক কারখানা গঙ্গার ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠে। গড়ে উঠেছিল ২৫টি চটকল। আজ তার মধ্যে অনেক মিলই বন্ধ। তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিনও এক রিপোর্টে পরোক্ষে স্বীকার করেছিলেন কারখানা বন্ধের পিছনে ইউনিয়নের ইউনিয়নবাজির কথা। বেলঘরিয়ার বড় কাপড়ের মিল 'মোহিনী' এখন বন্ধ। বাংলাদেশের ঢাকার সঙ্গে এরাজ্যেও মিল তৈরি হয়। 'মোহিনী মিল' বাংলাদেশে চালু আছে। কিন্তু এরাজ্যে বন্ধ।

নৃপেনবাবুর মুখে এসব কথা যত শুনছিল নীলুবাবু, ততই রাগ বাড়ছিল তাঁর। নৃপেনবাবু এক গ্লাস জল খেয়ে আবার শুরু করলেন। সোদপুরের হ্যারিকেন ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে গেছে আজ অনেকদিন আগে। বন্ধ শ্যামনগরের পিন ফ্যাক্টরি।

রাজ্য সরকারের উদাসীনতার কারণে বন্ধ কারখানায় গজিয়ে উঠেছে বহুতল আবাসন, শপিং মল, পার্কিং স্পেস। যার মদতে রয়েছে শাসকদলের ক্যাডাররাজ। কেবলমাত্র উত্তর ২৪ পরগণা জেলাতেই ৫৪৩৫ বিঘা জমি বন্ধ কারখানায় পড়ে রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণায় ফলতা শিল্পাঞ্চলের ১০০ একর জমি এখনও পড়ে রয়েছে। ১৯৮২ সালে জ্যোতি বসু চাষীদের কাছ থেকে কয়েক হাজার জমি অধিগ্রহণ করেন। আসলে এই রাজ্যে সরকার বন্ধ কারখানার অব্যবহৃত জমি পুনর্দখলের কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেনি। শুধু কেন্দ্রীয় নীতির দোষারোপ করেছে। প্রকৃত সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেনি। দুটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে। ট্যাংরা অঞ্চলের ন্যাশনাল ট্যানারি সংস্থার মালিকানা গ্রহণ করে আই আর বি আই। (ইণ্ডাসট্রিয়াল রিকন্সট্রাক্সন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)। ট্যানারি সংস্থায় মালিকানা ছিল সঞ্চয় সেনের। কয়েক বছর পর আই আর বি আই কোনও কারণে চলে গেলে, সিটু নেতাদের দখলে চলে যায় তা। পরে অবস্থার আরও অবনতি হয়। জমি শেড বেচে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ভারত ইলেকট্রনিক্স কিনে নেয় একটি সংস্থা। পরবর্তীতে শ্রমিকদের কাছ থেকে কোনও প্রস্তাবে যায় না মেলায়। ফলে এক্ষেত্রেও জমির শেড বেচে দেওয়া হয়। ২০০৫ সালে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার আইনে ১৪ জেড ধারা সংযোজন করে। যাতে রাজ্য সরকার শিল্পের জন্য যে সংস্থাকে জমি লিজে দিয়েছিল, তা যেন পুনর্দখল করা যায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দখলীকৃত কোনও জমিতেই শিল্প হয়নি। শ্রমিকদের বকেয়াও মেটানোও হয়নি। এই আইনের বলেই হিন্দুস্থান মোটরসের ৩১৪ একর জমির মাত্র ১০.৫ কোটি টাকায় হস্তান্তর হয়। কিছুদিন পরে ওই জমি মাত্র ১০.৫ কোটি টাকায় হস্তান্তর হয়। কিছুদিন পরে ওই জমি ২৯৫ কোটি টাকায় শ্রীরাম প্রপার্টিজের হাতে হস্তান্তর হয়। বাটা ইন্ডিয়ার ২৬২ একর জমি ১২ কোটি ২২ লাখ টাকায় বিক্রি হয়।

২০০৫-এর ১১ সেপ্টেম্বর পিপুলস্ ডেমোক্রেসিতে সিপিএমের প্রকাশ কারাট গর্ব করে বলেছিলেন বন্ধ কারখানার জমি পুনর্দখল হবে। কিন্তু বাস্তবে তার সিকিভাগও হয়নি। আর শুনতে ভলো লাগছিল না নীলুবাবুর। বুকের ভেতর একটা রাগ ক্রমশ যেন পাক খেয়ে উঠছিল। বললেন, বত্রিশ বছর ধরে শিল্পোন্নত বাংলাকে ধ্বংস করে আখের গুছিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। এরাজ্যে বিশ্বকর্মার কর্মই বন্ধ।

মূকাভিনয় থেকে নির্বাক কবির প্রস্থান

বিকাশ ভট্টাচার্য ।। রবীন্দ্রসদন, কলকাতা। ২১ আগস্ট সন্ধ্যা। প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণের স্থান নেই। একটু আগে তিনি তাঁর বহু অভিনীত স্কেচ— 'চোর' অভিনয়

যোগেশ দত্ত

করেছেন। দর্শকবৃন্দের করতালি ধ্বনিতে মুখরিত প্রেক্ষাগৃহ। পাদপ্রদীপের সামনে এগিয়ে এলেন ৭৬ বছরের নির্বাক কবি। ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন তাঁর মূকাভিনয়ের কষ্ট্যুম। আবহে তখন জাতীয় সঙ্গীতের সুর। সমস্ত দর্শক উঠে দাঁড়িয়েছেন নির্বাক কবিকে বিদায় জানাতে। এটাই তাঁর শেষ অভিনয় রজনী। এভাবেই সেদিন হল নির্বাক কবি। ভারতে মূকাভিনয়ের পথিকৃত কিংবদন্তী শিল্পী যোগেশ দত্তের মঞ্চ থেকে প্রস্থান।

বাউন্ডুলে ছেলেটার ছোট থেকেই শখ ছিল মানুষকে নকল করার। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে চারভাই আর এক বোনের সঙ্গে চলে এসেছেন এই বাংলায়। কখনও রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে এঁটো কাপ ডিস ধুয়ে, কখনও মুদিখানা দোকানে কাজ করে তাঁর পেট চলেছে। লক্ষ্য করতেন নানা ধরনের মানুষের চলা ফেরা, ওঠাবসা। আর তার থেকেই তৈরি হয়ে যেত তাঁর বিভিন্ন স্কেচ্, নির্বাক কৌতুক। শুরু বিভিন্ন কলেজ ফাংশনে ২৫/৩০ টাকার পারিশ্রমিকে নির্বাক কৌতুক পরিবেশন। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে মূক অভিনয়, তার অঙ্গ ভঙ্গী, মুদ্রা ইত্যাদির কথা বিস্তৃতভাবে বলা থাকলেও যোগেশ দত্ত তখনও তেমন করে মূকাভিনয়ের কথা জানতেন না। সরকারের তরফে তাঁকে বিশ্ব যুব সম্মেলনে পাঠানো হয় অন্যান্যদের সঙ্গে। বিদেশের মাটিতে গিয়ে তিনি দেখলেন মাইম আর তারপর ফিরে তিনি শুরু করেন মূকাভিনয়। বলা যায় ভারতে তিনিই এই শিল্পভাবনার পথিকৃৎ। ১৯৭১ সালে কালিঘাট পার্কে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর রিসার্চ সেন্টার — যোগেশ মাইম একাডেমী, যা সঙ্গীত নাটক একাডেমী এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্যতাপ্রাপ্ত। তৈরি করেছেন আরও অনেক খ্যাতকীর্তি মূকাভিনয় শিল্পীকে। ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁর মূকাভিনয় নিয়ে রাশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা, বৃটেন — কোথায় নয়! দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে মঞ্চে নিবেদন করেছেন তাঁর একান্ত ভালোবাসার মূকাভিনয়। ২১ আগস্টের সন্ধায় তিনি বিদায় নিলেন মঞ্চাভিনয় থেকে। কিন্তু তিনি শিখিয়ে যাবেন আমৃত্যু।

শব্দরূপ - ৫২১

পর্ণাশ্রী ঘোষ

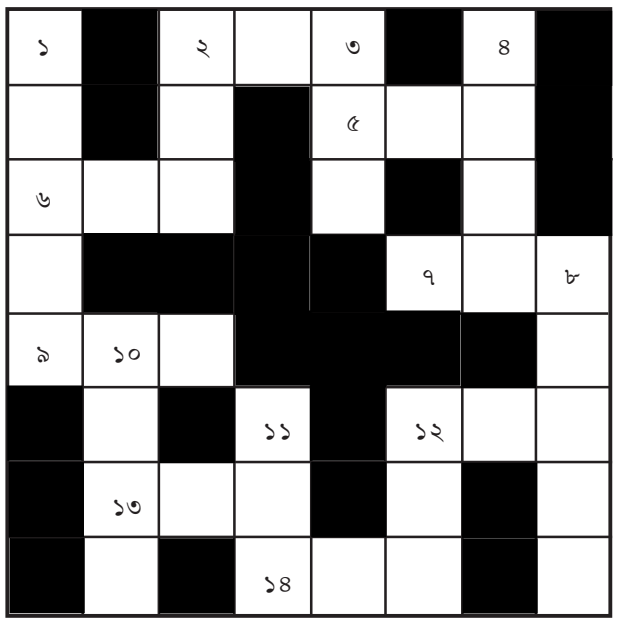

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. শ্রীকৃষ্ণের দরিদ্র ব্রাহ্মণ বন্ধু, সান্দীপনি মুনির অন্যতম ছাত্র, ৫. পৈতৃক ধনের অধিকারী, উত্তরাধিকারের দাবিপত্র, আগাগোড়া এক চর্মরোগবিশেষ, ৬. অসুর, দৈত্য, ৭. ধনদেবতা কুবেরের রাজধানী, গন্ধর্বদের বাসস্থান, ৯. দেবীর মহাশক্তিবিশেষ, শেষ দু'য়ে কণ্ঠ, ১২. উৎসব, ১৩. পৃথিবী, ১৪. বড় ও গভীর পুকুর।

উপর-নীচ ঃ ১. দিতি-পুত্র, ইনি পান্ডবদের তুষ্টিবিধানের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে এক অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করেন, একে-চারে হৃদয়, ২. কিষ্কিন্ধাপতি বানররাজ, ৩. বিলিতি মা, ৪. বড় পর্বতের নিম্নে ক্ষুদ্র পর্বত অবস্থিত, ৮. ইঙ্গ শব্দে বিশেষণে অঙ্গার বা আলকাতরা জাতীয় অম্লবিশেষ, ১০. হিন্দুদের পবিত্র নদীকে নিজ মস্তকে ধারণ করেছিলেন বলে শিবের অন্যনাম, ১১. বড় বাতাসাবিশেষ, ১২. পুষ্পরজ।

সমাধান শব্দরূপ ৫১৯

সঠিক উত্তরদাতা

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

গ	হি	ন	■	■	বে	ঢ	প
■	■	ব	নি	য়া	দ	■	র্ণা
■	ব	■	স্তে	■	র	সি	দ
ক	বি	রা	জ	■	কা	■	■
■	■	ঘ	■	সা	রি	সা	রি
অ	ভা	ব	■	ত্ব	■	য়	■
মি	■	প্রি	য়	ত	ম	■	■
ত	ন	য়া	■	■	ধু	ন	চি

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ অক্টোবর ২০০৯ সংখ্যায়।

ভারত সরকার তাড়াহুড়ো করছে কেন?

(৩ পাতার পর)

যারা নিজেদের আস্তিক বলে প্রচার করে তারাও প্রকৃত আস্তিক নয়, বরং নাস্তিকদের চেয়েও ঘোর অবিশ্বাসী। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। সিপিএম ঘোষিতভাবেই জাতীয়তাবাদ বিরোধী। কিন্তু এই স্বদেশী শিল্পবিরোধী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সক্রিয় বিরোধিতা সংসদে সিপিএম সাংসদরাই বেশি করেছে। কিন্তু যে বিজেপি ঘোষিতভাবেই একটি জাতীয়তাবাদী দল, তারা কিন্তু এখনও নীরব? কেন? কারণ এই চারিত্রিক বৈপরীত্য? কৃষি শিল্পের উপর এ এক নয়া আঘাত। এমনিতেই হাজার হাজার কৃষক সারা দেশে আত্মহত্যা করছে গত কয়েক বছর ধরেই, গত ৪০ দিনে শুধু অন্ধ্রপ্রদেশেই ২০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। এরপর এই সংখ্যা কোথায় দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। UN Food and Agriculture Organisation-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ২০০৯-এর শেষ দিকে সারা বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০০ কোটিতে। ভারতে ক্ষুধার্তের ক্রমাঙ্কে ৮৮টি দেশের মধ্যে স্থান হল ৬৬ তম। এই পরিসংখ্যান ২০০৮-এর। তথাকথিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পরিণতিতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতে ক্ষুধার্তের সংখ্যা কি দাঁড়াবে তা অনুমান করতেও ভয় লাগে।

কিন্তু দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই কংগ্রেস জোট সরকারের হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন? মাত্র কয়েক মাস পর নভেম্বর '০৯ মস্কো বথ'-র মন্ত্রী পরিষদের সম্মেলন হতে চলেছে। তার আগেই এইভাবে এশিয়ার গরীব অনুন্নত দেশগুলির বাজারকে মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে কেন? কোথায় রহস্য? এটাই এবার দেখব। তার আগে জানিয়ে রাখি গত এপ্রিলে জি-২০ বৈঠকে উন্নয়ণশীল দেশগুলিকে ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের অঙ্গ হিসাবে আই এম এফের কাছ থেকে সদস্য দেশগুলি ২৫ হাজার কোটি ডলার, ভারতের বরাদ্দ ৪৭৮ কোটি ডলার। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে এই অর্থ আগামী ২৮ আগস্ট '০৯ ভারতের হাতে আসবে এবং শোনা যাচ্ছে সেইদিনই ভারত তার বিদেশী বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করবে। আই এম এফ'র আর্থিক প্যাকেজের সঙ্গে কি বাণিজ্য নীতির যোগ আছে? ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৬-৬৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জমানায়। আগের দু'বছর নিদারুণ খরা এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতীয় অর্থনীতি হয়ে পড়েছিল প্রায় পঙ্গু। সেই সময়ও ভারতকে আই এম এফ বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু সঙ্গে ছিল শর্ত। ভারত সেদিন আই এম এফ'র ফাঁদে পা দিয়ে নিজের মুদ্রার ৫৮ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল। সেই অব মূল্যায়নের ধাক্কা ভারতীয় অর্থনীতি আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৬০-৬১ সালে ডলারের তুলনায় টাকার বিনিময় মূল্য ছিল মাত্র ৪ টাকা ৭৬ পয়সা আর আজ হয়েছে প্রায় ৫০ টাকা। অতএব এবারও আই এম এফ'র ঋণের কোন কোন শর্তে কংগ্রেস সরকার দেশকে জড়িয়ে ফেলবে বলা মুশকিল। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলি এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়ত?

আগামী নভেম্বরে '০৯ জেনেভা-তে বসছে ডব্লু টিও'-র মন্ত্রী পরিষদের সম্মেলন। ২০০১ সালে দোহা সম্মেলনে বাজপেয়ি সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী মুরাসোলি মারান শিল্পে অনুন্নত দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলিকে সংগঠিত করে উন্নত দেশগুলির অন্যায় আবদারকে রুখে দিয়েছিলেন। আজও তারা এই দেশগুলির বাজার এক তরফা দখল করতে পারেনি। দোহা আলোচ্য কর্মসূচী আজও আটকে আছে। কিন্তু এই অচলাবস্থা কাটাতে আজ রাস্তায় নেমেছে সেই ভারতেরই কংগ্রেস সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী আনন্দ শর্মা। আগামী ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর '০৯ দিল্লীতে তিনি সদস্য দেশগুলির বৈঠক ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য অবশ্যই নভেম্বরের আগেই ডব্লু টি ও-কে এড়িয়ে একটি একটি দেশের সঙ্গে বা জোটের সঙ্গে (আশিয়ান ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে রাখা যাতে আমেরিকাসহ উন্নত দেশগুলির পক্ষে শিল্পদ্রব্য বিক্রির বাজার উন্মুক্ত হতে পারে।

একথা হলফ করেই তাই বলা যায় যে, এইসব মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে সদস্য দেশগুলির সভা ডাকা এবং জেনেভায় দোহা আলোচ্যসূচীর অচলাবস্থা দূর করা — সবই আমেরিকার দাদাগিরিকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। তা না হলে যে ৪৭৮ কোটি ডলার মিলবে না। ৩রা সেপ্টেম্বরের আগেই এই অর্থ সব সদস্য দেশগুলির হাতে পৌঁছে যায় কি না সেটাই এখন দেখার।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

ব্যতিক্রমী দুর্গাপূজা

(১১ পাতার পর)

কমিটির অন্যতম সদস্য কার্তিক সিংহ বলেন — অষ্টমী থেকে পুজো আরম্ভ হয়। আশেপাশের ২০টি গ্রামের বাসিন্দারা পুজোকে ঘিরে আনন্দে মেতে ওঠে।

পেটকাটি দুর্গা — গ্রামের নাম গদাইপুর। রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) থানার অন্তর্গত। জঙ্গিপুর স্টেশন হতে ২ কিমি দূরত্বে। কথিত যে এই গ্রামে একটি বালিকা হঠাৎ নিখোঁজ হয়। বহু খোঁজাখুঁজি হয়। কিন্তু পাওয়া যায় না। অবশেষে গ্রামের ক্ষুদিরাম রায় স্বপ্নাদেশ পান দেবীর — আমি মেয়েটিকে খেয়ে ফেলেছি। আমার পেট কাটলে ওকে পাবি। পরদিন সকালে ক্ষুদিরাম মন্দিরে গিয়ে দেখেন, মায়ের মুখে এক টুকরো কাপড় লেগে। মূর্তির পেট কেটে সত্যিই মেয়েকে পাওয়া যায়। সেই থেকে দেবী পেটকাটি দুর্গা।

যে দেবীর বিসর্জন নেই — বিষ্ণুপুরে মল্লরাজারা উপাসনায় বৈষ্ণব হলেও, বাংলার ঐতিহ্য মেনে দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। সে পুজোর বয়স অতি প্রাচীন। অনেকে বলেন হাজার বছর। এছাড়াও আছে ৩০০/৪০০ বছরের পুজো। তবে দেবী কৈলাসেশ্বরীর বৈভব আলাদা। তাঁর পুজোয় আবাহন আছে বিসর্জন নেই।

বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণগঞ্জে কৈলাসেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন সেখানকার নামকরা ধনী ভূদেব রায়। তিনি ও তাঁর ভাই কৃপারাম রায় বিল্ববৃক্ষের নীচে মায়ের আরাধনা করতেন। পরে দেবীর স্বপ্নাদেশ অনুসারে তৈরি করেন দেবীর নির্দিষ্ট প্রতিমা ও তাঁর মন্দির, ১৯২৬ সালে। দেবী মূর্তির বৈশিষ্ট্য হলো মায়ের পত্নিগৃহের সপরিবার প্রতিচ্ছবি। প্রায় ১২৫ বছর আগে মূর্তির রূপদানে ছিলেন বর্ধমানের নবকুমার সূত্রধর। প্রতিমার আরও বৈশিষ্ট্য হল দেবীর সামনে একাসনে বসা জমিদার ও শ্রমিকের যৌথ মূর্তি আর হরিহর মূর্তি। শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলনের প্রতিভূরূপে। কৈলাসেশ্বরীর পুজোর অন্যতম শরিক হলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিষ্ণুপুর ঘরানার অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার। সেই সূত্রে পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত মন্দিরের পাঠমন্দিরে বসে ধ্রুপদ বীমার ও আগমনী গানের আসর। দশমীর দিন অবশ্য উৎসবে ছেদ পড়ে। কিন্তু দেবী থেকে যান নিজ আলয়ে।

দেবীর বিসর্জন এক বছর পর— দুর্গার নাম পাতিঠাকুর। পুজো হয় বীরভূমের হেতমপুরের মুন্সিদের দুর্গামন্দিরে। স্থানটি হেতমপুরের রাজবাড়ির কাছে। এই রাজবাড়িরই দেওয়ান ছিলে ঈশান মুন্সী। একদিন সন্ধ্যায় নিকটবর্তী নদীতীরে ধরে যাওয়ার পথে দেখতে পান এক বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধার রূপের জৌলুষে হতবাক তিনি। বৃদ্ধাই তাঁকে দুর্গাপুজো ও মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। ঈশান তাইই করেন। পুজোর বয়স এখন সার্ধশতবর্ষের অঙ্গনে। এখানে দেবীর ভাসান হয় একবছর পর। নতুন প্রতিমা সেই বেদীতে এলে।

সংস্কৃত জনপ্রিয় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে

প্রণব নন্দ ।। সংস্কৃত ভারতী-র পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে গত ২১ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দশদিনব্যাপী আবাসিক সংস্কৃতে কথোপকথন প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত কয়েক বছর ধরে তারা এধরনের বর্গের ব্যবস্থা করে আসছে। এবারও আগেরবারের মতোই বর্গ কলকাতার কাছেই হালিশহর নিগমানন্দ সারস্বত মঠেই অনুষ্ঠিত হয়। বর্গে পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলা থেকে ৮১ জন শিক্ষার্থী যোগ দেন। তাদের মধ্যে মা-বোনেদের সংখ্যাই ছিল ৩৭ জন।

বর্গে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিতরা ছিলেন। এছাড়া বর্গ পরিচালনার জন্য শিক্ষক ও ব্যবস্থাপক ছিলেন ১৭ জন। সংস্কৃত ভারতী'র দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ এবং প্রণব বর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা দেখ-ভাল করেন।

২১ আগস্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিদ্যাভারতী'র পূর্ব-ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক বিজয় গণেশ কুলকার্ণি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

সভাপতিত্ব করেন হালিশহর নিগমানন্দ মঠের মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের পুরীধামের ভারপ্রাপ্ত রমাকান্ত মিশ্র।

বর্গের দৈনন্দিন কর্মসূচী ছিল ঠাসা — ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা। সবকিছু কথাবার্তাই সংস্কৃতে। তার মধ্যে কথোপকথন, প্রশিক্ষণ ছাড়াও হাল্কা ব্যায়াম, খেলাধূলা, প্রাণায়াম, যোগাসন, নির্দিষ্ট বক্তৃতা এবং স্ত্রোত্রপাঠও ছিল।

বর্গ পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল এবং সংস্কৃত ভারতীর কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশ কামাথ। দীনেশজী বর্গের সমারোপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, একসময় এদেশে সংস্কৃতই কথ্য ভাষা ছিল। সংস্কৃত ভারতী সহজ সরলভাবে সংস্কৃতে কথোপকথন সর্বসাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করতে এবং প্রচলন করতে উদ্যোগী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংস্কৃত ভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা পদ্মকুমারজী। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সারা দেশে স্বামী নিগমানন্দ মঠ সমূহের প্রধান অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ। তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ধুতি ও শাড়ি (মেয়েদের) প্রদান করেন এবং সংস্কৃত প্রসারে যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মঠের পক্ষ থেকে দু'দিন সকলের স্বল্পাহার ও অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বর্গে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন — কেরল থেকে আগত রণজিৎ কুমার, বাংলার স্বপন বিশ্বাস, মৌমিতা বসু, কাশীনাথ নন্দী প্রমুখ। সব মিলিয়ে বলা যায় বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গে যুবসমাজ এবং শিক্ষক সমাজের কাছে সংস্কৃত ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

ছবিতে বাঁ দিক থেকে রণজিৎ কুমার, অরবিন্দ দাস, বিজয় কুলকার্ণি, স্বামী বিমলানন্দ এবং রমাকান্ত মিশ্র। ছবি ঃ মৌমিতা বসু

নদীয়াতে গ্রামীণ শ্রমিক সমাবেশ

গত ২০ আগস্ট নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া ও বেথুয়াডহরীতে বিড়ি শ্রমিক, তাঁত শ্রমিকদের দুইটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীয় বিড়ি মজদুর সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ধর্ম্মদাস শুক্লা, বি এম এসের শিল্প সমূহের পরিসঙ্ঘ-এর সাধারণ সম্পাদক বি এল রাজাবত, অন্যতম সম্পাদক শুকদেব মিশ্র, বি এম এস-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক বৈজনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন । কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন শ্রমিক বিরোধী নীতি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তের ফলে দেশে কৃষক ও কৃষিজাত দ্রব্যের সর্বনাশ, ভয়াবহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়। দুটি সমাবেশেই কয়েক হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়।

সমাজ সেবা ভারতীর নবগঠিত কার্যসমিতি

গত ১৯ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণার কর্ণমাধবপুর বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের সভাগারে সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে ৭০ জন প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক না হওয়ার আহ্বান জানান। সমাজ সেবা ভারতীর সভাপতি বিশ্বনাথ মুখার্জী, সঙ্ঘের প্রান্ত সহ কার্যবাহ প্রদ্যুৎ মৈত্র ও প্রান্ত সেবা প্রমুখ ডাঃ সনৎ বসুমল্লিক ও মনোজ চট্টোপাধ্যায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ২০০৯-১০ সালের জন্য কার্যকরী সমিতি ঘোষিত হয়।

সভাপতি — সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি — ডাঃ নরেশ চন্দ্র নাগ ও ডঃ মানিক চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক — অহিজিৎ (পবন) চৌধুরী, সহ সম্পাদক — গোপাল কর ও শাশ্বতী নাথ, কোষাধ্যক্ষ — দিলীপ কুমার আঢ্য, সদস্য — মনোজ চট্টোপাধ্যায়, অলোক মুখোপাধ্যায়, মোহনলাল পারেখ, কমল চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশু মাইতি।

কিষাণ সঙেঘর 'বলরাম জয়ন্তী'

পশ্চিম কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার কর্মামারিতে গত ২৬ আগস্ট ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে পালিত হল 'বলরাম জয়ন্তী'। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভগবান বলরামের পূজা করা হয়। সেই সঙ্গে লাঙ্গল পূজা করা হয়। বলরাম জয়ন্তী উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন কিষাণ সঙ্ঘের কোচবিহার জেলার সহ-সভাপতি অনিল বর্মণ, জেলা সম্পাদক ভবেশ বর্মণ ও সঙ্ঘের জেলা প্রচারক অঙ্কুর সাহাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ওইদিন গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরেই লাঙ্গল পূজা হয়।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে উত্তর কাছাড়ে যজ্ঞানুষ্ঠান।

এন সি হিলস-এ সেবিকা সমিতির রাখীবন্ধন

অসমের এন সি হিলস জেলাতে গত ছয় মাস ধরে খৃস্টান মিশনারিরা অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। এন সি হিলস জেলাতে বসবাসকারী দুই জাতি গোষ্ঠী হল — নাগা ও ডিমাসা। খৃস্টান মিশনারীরা এই এন সি হিলস জেলাতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছে। অবশ্য মিশনারীদের এই চক্রান্ত কার্যকর হতে পারেনি। কেননা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি-র মাধ্যমে এর প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়েছে।

ষোলোশো শতাব্দী থেকে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও অনৈক্য ছিল না। বরং এদের মধ্যে সুন্দর সদ্ভাব বজায় ছিল। কিন্তু রাজনীতির চাপে এই দুই জাতি একেবারে বিপর্যস্ত। এখানে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ফলে দুই জাতির সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি এই এন সি হিলস জেলাতে প্রথম রাখীপূর্ণিমা উৎসব পালন করে। প্রায় সাড়ে তিনশো মানুষের উপস্থিতিতে রাখীবন্ধন পালিত হয়। এইদিন দুই জনজাতির মধ্যে রাখী পরানোর মধ্য দিয়ে শান্তির সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানের দিন উপস্থিত ছিলেন সমিতির অখিল ভারতীয় অধিকারী শান্তা আক্কাজী। এবারই প্রথমবার গত ২৩ আগস্ট জেলাতে গণেশ পূজা পালিত হয়।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পক্ষ থেকে দুই গোষ্ঠীকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য দুশো হস্তচালিত তাঁত বিতরণ করা হয়েছে।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের জাতীয় কার্যকারিণী অধিবেশন

গত ২৯ থেকে ৩১ আগস্ট, হায়দরাবাদে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জাতীয় অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য অজিত বিশ্বাস ও দীনেশ সাহা অংশ গ্রহণ করেন।

অধিবেশনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয় —

১। "শিক্ষা সকলের জন্য" — সারা দেশে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা দরকার।

২। ৩ বছর বয়স থেকে প্রাক্ -প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন।

৩। সাচার কমিশন দেশকে বিভাজনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চাই।

৪। যশপাল কমিশন ও ন্যাশনাল কমিশনের প্রতিবেদন গভীরভাবে পর্যালোচনা করা চাই।

৫। ইউ জি সি-এর মতো জাতীয় স্কুল কমিশন গঠন করতে হবে।

৬। সর্বশিক্ষা অভিযান ও মিড্-ডে-মিলের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

রাজস্থানের জয়পুরে আগামী ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর ৪র্থ সর্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি জেলা থেকে সর্বাধিক ৫জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করবেন বলে জানানো হয়েছে।

১৯ অক্টোবর '০৯

স্বস্তিকা

দীপাবলী সংখ্যার আকর্ষণ

'গোরু বাঁচলেই গ্রাম বাঁচবে' — এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী বিজয়া দশমী থেকে সারা ভারতবর্ষে আরম্ভ হতে চলছে 'বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা'। এই যাত্রার উদ্দেশ্য ও আদর্শ, প্রারম্ভিক তথ্য এবং অর্থনৈতিক বিকাশে গো-সম্পদের ভূমিকা, গোরু নিয়ে দলাদলি, পশ্চিমবঙ্গের গোশালা প্রভৃতি একগুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে —

বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা

রঙিন প্রচ্ছদ। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।
দাম : ছয় টাকা। সত্বর কপি বুক করুন।

Swastika
14 September - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

অমরেন্দ্র সান্যালের 'কোলাজ'

শ্যামাপ্রসাদ সরকার।। সাহিত্যিকের তৈরি 'কোলাজ'? সে আবার কী বস্তু? সুকুমার রায়ের 'হাঁসজারু' নয়তো? 'মনসুর মিঞার ঘোড়া'র বিখ্যাত লেখক অমরেন্দ্র সান্যাল গত দু'বছর ধরে 'কোলাজ' তৈরি করছেন। কিন্তু প্রদর্শনী করেননি। ইতিমধ্যে তিনি ছ-মাসের জন্য নিউজিল্যান্ড ঘুরে এলেন, সেখানকার বাঙালিদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সেখানে কোনও প্রদর্শনী করেননি। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল প্রথমে তাঁর কাজ দেখাবেন তিনি এদেশের কোলাজ মাস্টার বি আর পানেসরকে। পানেসরের হোস্টেলে

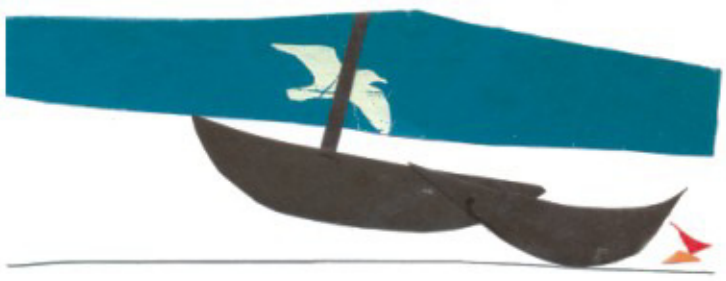

অমরেন্দ্রবাবু যখন তাঁর ছবিগুলি দেখান তখন আনন্দে পানেসর জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁকে। আশীর্বাদ করেছিলেন ভবিষ্যতে আরও বড় হবার জন্য।

নবদ্বীপে যখন তিনি খুব ছোট তখন থেকেই ছোট ছোট রং-বেরংয়ের কাগজ কেটে ছবি তৈরির চেষ্টা করতেন। শিশুমনে কত কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন। তারপর বড় হয়ে সাহিত্যের জগতে তিনি মগ্ন হয়ে পড়েন। গল্প, উপন্যাস রচনায় মেতে ওঠেন। এই কিছুদিন যাবৎ শিল্পের জগৎ তাঁকে টানতে শুরু করেছে। আর তা থেকেই তাঁর নতুন করে কোলাজ সৃষ্টির প্রয়াস। বর্তমানে শিল্পীদের মধ্যে বি আর পানেসরের পর শাকিলা 'কোলাজ' তৈরিতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শাকিলার তৈরি কোলাজ 'মা কালী' এক ঐতিহসিক সৃষ্টি। এ ছবি শুধু সীমা আর্ট গ্যালারীতেই দেখানো হয়নি, পৃথিবীর বড় বড় শহরেও প্রদর্শিত হয়েছে।

অমরেন্দ্র সান্যাল তাঁর কোলাজে মাঠ

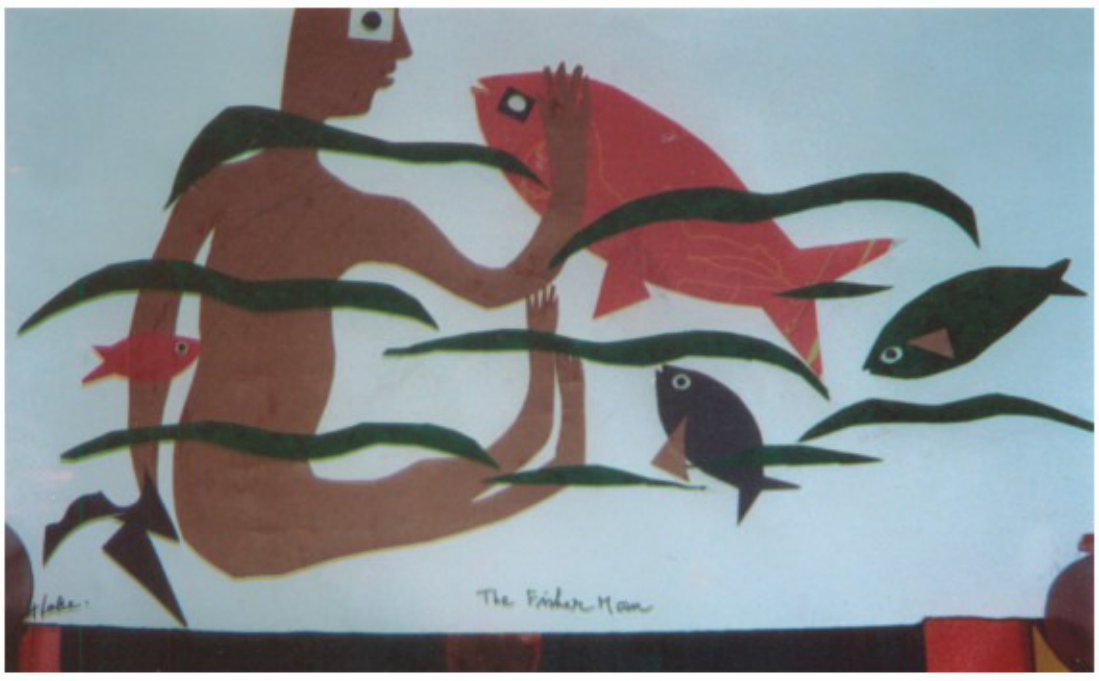

ফেরৎ এক সাঁওতাল মেয়ে এনেছেন যার বুকে টিয়া পাখি। নদীতে নৌকায় ঢেউ উঠছে মাথার ওপর অসীম আকাশ, কোথাও একটা বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইছে, কোথাও বা কাঠপুতলী, চাষী বউ গাঁয়ে ফিরছে কাঁধে শালিক, একটি মিছিলের ছবি, দোলনায় দোলা, সঙ্গমের ছবি, পুরুষ, জীবন, একাকী জীবন, জলে ঢেউ দিও না গো সখী , গান্ধীজী, ভিন্নতর জীবন। এ সবই তাঁর শিল্পের জগৎ। সাহিত্যের জগতে তিনি এক কুটিল পৃথিবীর ছবি আঁকেন, কিন্তু শিল্পের জগতে? সেখানে তাঁর পৃথিবী অনেক বেশি সতেজ, জীবনময়। তাই সারাদিনের পরিশ্রমের পর স্বচ্ছন্দে এক মাঠ ফেরৎ সাঁওতাল মেয়ে তাঁর ছবিতে বুকে টিয়া পাখি নিয়ে ঘরে ফিরতে পারে, নীল আকাশের নিচে নদীতে নৌকায় ঢেউ ওঠে। গান্ধীজী চাদর মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেন একাকী। চাষী বউয়ের কাঁধে দোলে শালিক। আপন মনে গান গেয়ে চলে এক বাউল এবং আরও শহর ও গ্রামের নানা চিত্র। ছবিগুলি দেখলে মনে হয় অমরেন্দ্র সান্যালের সাহিত্যিক সত্ত্বার চেয়ে শিল্পী সত্ত্বাই বুঝি এখন যথেষ্ট বেশি প্রখর। প্রাণময়। আশা রাখি, দর্শকেরা এই কোলাজ শিল্পীকে আপন করে নেবে।

প্রকাশিত হল

পুজো মানেই ঠাকুর দেখা পুজো মানে হারিয়ে যাওয়া
পুজো মানেই খাওয়া-দাওয়া পুজো মানে চাওয়া-পাওয়া
পুজো মানেই একটু ছোঁয়া ওলট-পালট মুগ্ধ হওয়া

পুজো সংখ্যার অনবদ্য পুষ্পাঞ্জলি

উপন্যাস
সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত
সুমিত্রা ঘোষ
দীপঙ্কর দাস
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প
রমানাথ রায়
শেখর বসু
এষা দে
গোপালকৃষ্ণ রায়
দীপক চন্দ্র,
জিষ্ণু বসু

ষষ্ঠীতে দেবী ভাবনা
সপ্তমীতে গল্প
অষ্টমীতে প্রবন্ধ
নবমীতে উপন্যাস
দশমীতে ছড়া
শেষ প্রহরে রম্যরচনা

ভ্রমণ ঃ সৌমেন নিয়োগী

প্রবন্ধ
প্রণব চট্টোপাধ্যায়
প্রণব রায়
দেবীপ্রসাদ রায়
তথাগত রায়
রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
দীনেশচন্দ্র সিংহ
বলরাম চক্রবর্তী
নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য
সুমিত চক্রবর্তী

সত্বর কপি বুক করুন ● দাম চল্লিশ টাকা মাত্র

রম্যরচনা ঃ চণ্ডী লাহিড়ী ● ছড়াকাহিনী ঃ শিবাশিস দণ্ড ● দেবী প্রসঙ্গ ঃ স্বামী অশোকানন্দ

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE

স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com